বঙ্গীয় নাট্যশালায়

নটচূড়ামণি

স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

(নটের জীবনী ও নাট্যলীলা)

নাট্যসম্রাট

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত।

মিনার্ভা থিয়েটার

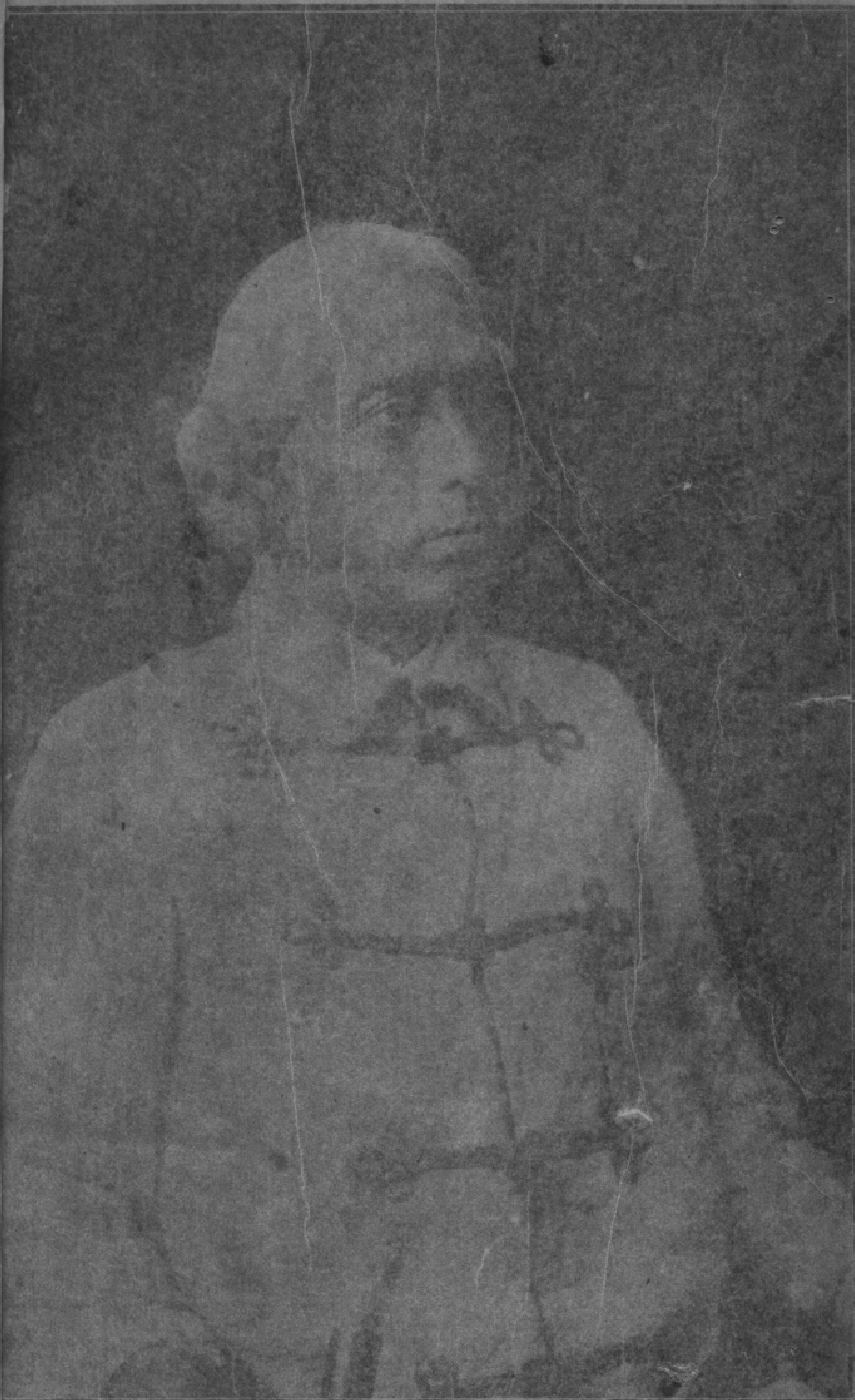
হইতে

শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—০—

১০ই আশ্বিন, ১৩১৫ সাল।



নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

বঙ্গীয় নাট্যশালায়

নটচূড়ামণি

স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

(নটের জীবনী ও নাট্যলীলা)

নাট্যসম্রাট

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত।

মিনার্ভা থিয়েটার

হইতে

শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—০—

১০ই আশ্বিন, ১৩১৫ সাল।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গীয় নাট্যশালায়

নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

গত ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে নটাগ্রগণ্য অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর জীবনলীলার অবসান হয়। কর্ত্তব্যবোধে আমি গত ৩রা আশ্বিন, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ হইতে এই শোক সংবাদ প্রচার করি; কিন্তু আমায় নানা প্রকারে আবদ্ধ হইয়া এই নিদারুণ সংবাদ প্রচার করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঐ নটরাজের বর্ণনা সময় সাপেক্ষ। বহুদিন তিনি রঙ্গালয়ে লিপ্ত, তখন রঙ্গালয়ের অবস্থা অন্যরূপ, রঙ্গালয় গঠন করিতে তাঁহাকে বিস্তর আয়াস পাইতে হইয়াছে, রঙ্গালয় লইয়াই তাঁহার জীবন। তাঁহার প্রথম উদ্যম ও চেষ্টা বর্ণনা ব্যতীত, তিনি কি, তাহা বুঝান যায় না। বহুদিন গত হইয়াছে, অনেক ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছি, সুতরাং বুধবার হইতে শনিবারের ভিতর সমস্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যাঁহাদের লইয়া তাঁহার কার্য্য ছিল, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কালগ্রাসে পতিত। সুদক্ষ ষ্টেজম্যানেজার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর, প্রসিদ্ধ প্রহসন-প্রণেতা ও দক্ষ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ব্যতীত বোধ হয় আর অপর কেহই জীবিত নাই। অবৈতনিক সম্প্রদায়ে যাঁহারা

কয়েকদিনের জন্য যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জীবিত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের নামোল্লেখ তাঁহাদের অনুমতি-ভিন্ন অকর্ত্তব্য বিবেচনায় করিলাম না। ইহাঁদের নিকট ঘটনাবলী সংগ্রহ করা সুবিধা হইল না এবং যদিও সে সমস্ত ঘটনা কোনও মতে সংগ্রহ করিতে পারিতাম, তাহা বিবৃত করাও উক্ত রাত্রে অসম্ভব ছিল। সে দিন মিনার্ভায় একখানি নূতন গীতিনাট্যের অভিনয় মিউনিসিপ্যাল আইনে তাহা ১টার মধ্যে শেষ করিতে হইবে, সুতরাং নটের যথাযোগ্য জীবন বর্ণনায় সময় অতিবাহিত করা অসম্ভব হইল। *

আইনের বাধা প্রযুক্ত ও অন্যান্য কারণে অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাহা লিখিয়াছিলাম, নিম্নে প্রকটিত হইল। কিন্তু এক্ষণে যাহা অনুরুদ্ধ হইয়া লিখিতেছি, তাহাও সময়-সাপেক্ষ, কিন্তু অনেকেরই অনুরোধ, উপস্থিত যতদূর পারি, এই নটকুলাগ্রগণ্যের বিবরণ লিখি। লিখিতেছি বটে, কিন্তু পাঠক, তাহা পূর্ণ হইবে না, এ নিমিত্ত মার্জ্জনা করিবেন।

---

* মিউনিসিপ্যাল আইন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পুস্তকের শেষভাগে পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

(১৩১৫ সাল, ৩রা আশ্বিন, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে দর্শক সম্মুখে পঠিত।)

দর্শক মহোদয়গণ,—

বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের শেখর খসিয়াছে, অর্দ্ধেন্দুশেখর পরলোকগত। বিধাতার বিড়ম্বনায় সর্ব্বাপেক্ষা বয়োধিক হইয়াও আমাকেই মহারথী অভিনেতাগণের মৃত্যু উল্লেখ করিতে বার বার বাধ্য হইতে হইয়াছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বর্গীয় মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের স্বর্গীয় মাতুল, বাগবাজার নিবাসী শ্যামাচরণ মুস্তফীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুস্তফী মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর বাটীতে নিয়োগী মহাশয়ের ও ৺ দীননাথ বসু প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের উদ্যোগে একটী Morning School স্থাপিত হয়, ঐ স্কুলে বালক অর্দ্ধেন্দুকে আমি প্রথম দেখি। সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে অর্দ্ধেন্দু জন্মগ্রহণ করেন। তাহাতে নির্ণয় করা যায় যে, ৫৯ বৎসর বয়সে, নিষ্ঠুর কাল, রঙ্গালয়ের এই অমূল্য রত্ন হরণ করিয়াছে। কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাঁহাকে এক অবস্থায় দেখিয়া ও প্রসিদ্ধ স্বর্গগত অভিনেতা মতিলাল সুরের তিনি সমবয়স্ক হওয়ায় আমার ধারণা ছিল, অর্দ্ধেন্দুর বয়স আরও দুই একবৎসর বেশী। Morning School এ দেখিবার পর মধ্যে কিছুদিন আর অর্দ্ধেন্দুকে দেখি নাই। তৎপরে আমার এক

বন্ধু স্বর্গীয় কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বসুপাড়ার ৺ দিগম্বর দে মহাশয়ের বাটীতে বাস করেন। তাঁহার অগ্রজ লোকনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ মুস্তফী মহাশয়ের একজন বন্ধু ছিলেন। লোকনাথ নকুলে লোক, দেশবিদেশের ভাষা অনুকরণ করিতে পারিতেন। বহুদিন পরে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে আমি সেই লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমভিব্যাহারে দেখি। লোকনাথ বলিতেছেন, "বল বল 'প্যাটের যে কামর' বল্‌তো?" অর্দ্ধেন্দু পূর্ব্ববঙ্গীয় উচ্চারণে এই পংক্তিটী আবৃত্তি করেন। এই আবৃত্তিটী লোকনাথ অনুকরণ-পটু হইলেও তাঁহার অনুকরণ অপেক্ষা অর্দ্ধেন্দুশেখরের অনুকরণ অতি স্বাভাবিক শোনা গেল। স্মরণ হইতেছে যেন সে সময় ঠাকুরবাড়ীতে 'চক্ষুদান' ও "উভয় সঙ্কটের" অভিনয় চলিতেছিল। অর্দ্ধেন্দু সেই অভিনয়ের অনুকরণ আমার বন্ধুর বাসায় আসিয়া কখন কখন করিতেন। "তোর লাগি ভাবি ভাবি নাভি ফুলেছে।" অর্দ্ধেন্দুর মুখনিঃসৃত এই পংক্তিটী আমার এরূপ সুন্দর লাগিয়াছিল যে তাহা উল্লেখ করায় আমার বোধ হইতেছে যেন এখনো আমি তাহা শুনিতেছি। তৎপরে বহুদিন আর অর্দ্ধেন্দু কোথায় জানিতাম না।

যখন বাগবাজারে "সধবার একাদশী" থিয়েটার সম্প্রদায়ের আড্ডা বসে, তখন উক্ত সম্প্রদায়ের উৎসাহী প্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে তিনি কয়লাহাটায় "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনের অভিনয় দেখিতে গিয়া, একজন অত্যুৎকৃষ্ট অভিনেতা দেখিয়াছেন, অভিনেতা বাগবাজারেই

থাকে। আমার বিশেষ আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ, অভিনেতাটীকে আনেন। দেখিলাম আমার পূর্ব্ব পরিচিত অর্দ্ধেন্দুশেখর।

কৃতবিদ্য বন্ধুগণেবেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার দীনবন্ধু বাবু,রায় বাহাদুর ৺রামচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে, উক্ত অবৈতনিক সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থে আসেন। অর্দ্ধেন্দুর"জীবনচন্দ্রের" ভূমিকা (Part)। জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্দ্ধেন্দুকে বলেন, "আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব।" অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রত্যেক অভিনয়ের যদি পূর্ণ ব্যাখা করা যায়, তাহা হইলে দর্শকবৃন্দ মিউনিসিপ্যাল আইনবদ্ধ ১টা রাত্রি পর্য্যন্ত শুনিয়াও শেষ করিতে পারিবেন না। সুতরাং সে সকল বর্ণনায় আমি ক্ষান্ত রহিলাম।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, অর্দ্ধেন্দুর "জীবনচন্দ্র" দেখিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিভার পরিচয় পান নাই। "লীলাবতীতে" অর্দ্ধেন্দুকে 'হরবিলাস' দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে আর প্রশংসা ধরে না। তাহার পর ন্যাসান্যাল থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম 'নীলদর্পণ' অভিনয় আরম্ভ হইল। অর্দ্ধেন্দু গোলক বসু, উড সাহেব,একজন রায়ত ও সাবিত্রীরূপে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক ভূমিকাই বিস্ময়কর, প্রশংসায় কলিকাতা পরিপূর্ণ। আমি শুনিয়াছিলাম, দেখি নাই, কারণ ন্যাসান্যাল থিয়েটারের সহিত প্রথমে

আমার সম্বন্ধ ছিল না। ক্রমে ক্রমে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নাটক ও প্রহসনগুলির অভিনয় চলিতে লাগিল। প্রতি গ্রন্থে অর্দ্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়। তন্মধ্যে নবীন তপস্বিনীর 'জলধরের' অভিনয় অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয়। নাটোরাধিপতি উচ্চ হৃদয় রাজা চন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে বিভোর হইয়াছিলেন বলিলে ঠিক বর্ণনা করা হয় না। সঙ্গীতাচার্য্য ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিতেন,—"সমজদার গুণীর গোলাম, আর গুণী বে-সমজ্‌দারের গোলাম।" গুণী অর্দ্ধেন্দুশেখর ও সহৃদয় সমজদার রাজা চন্দ্রনাথ, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথার একটী প্রমাণ। ক্রমে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে "নয়শো রোপেয়া" অভিনয় হইল। যাহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজি থিয়েটারে ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সম্মুখে, অর্দ্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন, যে রোপেয়ায় 'ছাতুলালের' ভূমিকায় এই বাবুটীর অভিনয় যাহা দেখিলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। আক্ষেপ—সময় নাই, প্রত্যেকটী বর্ণনা করিতে পারিলাম না। অর্দ্ধেন্দু যে অংশ স্পর্শ করিতেন, তাহাই অননুকরণীয় হইত।

এতক্ষণ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়-শক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু তিনি শিক্ষা প্রদানে কিরূপ সুদক্ষ ছিলেন, তাহার উল্লেখ করি নাই। প্রথম সধবার একাদশীতে দরোয়ানদ্বয়কে যাহা শিখাইয়াছিলেন, সেরূপ কেহ পারে

বলিয়া আমার ধারণা নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর মাষ্টার—এ কথা সর্ব্বত্র প্রচার; প্রত্যেক ছাত্রকে কিরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এস্থলে বর্ণিত হইতে পারে না। তাঁহার দীক্ষার পরিচয়, সুযোগ্য ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। শুনিতে পাই, "বিশ্বকোষে" বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে, "এখন বাঙ্গালা নাট্যশালায় দুইটী রীতিতে অভিনয় হইয়া থাকে।" লেখকের মতে দুইটীর মধ্যে একটী অর্দ্ধেন্দুবাবুর রীতি। ইহাতে বোধ হয়, বিশ্বকোষের এই লেখক বিশেষ যত্ন ও অনুসন্ধান করিয়া লেখেন নাই। তিনি অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় ও দীক্ষাপ্রণালী বোঝেন নাই। অর্দ্ধেন্দুর কিরূপ শক্তি, সংক্ষেপে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব।

যাহারা Natural কথাটী কুড়াইয়া লইয়া অভিনয় সমালোচনা করেন, তাঁহারা আমি অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি, তাহা বুঝিবেন কি না জানি না। যিনি পাশ্চাত্য প্রদেশের অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি বুঝিবেন, যে অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি, এক্ষণে সভ্যপ্রদেশে তাহা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই;—অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা (part) লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দু তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিত অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। যতবার প্রবেশ করিতেন, ততবারই দর্শক আগ্রহের সহিত বলাবলি করিতেন—অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমিকা, তাহা নয়।

এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একক, দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে, দৃশ্যপট, অভিনেতা প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হয় না। বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় 'দেবকার্সন' নামক এক ইংরাজ এই উচ্চ শক্তির নিম্নস্তরস্থ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ইংরাজমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দুকে লোকে সাহেব বলে, তাহার কারণ দেবকার্সন যেমন বাঙ্গালী বাবু লইয়া ঠাট্টা করিতেন, অর্দ্ধেন্দুও তেমনি পূর্ব্বোক্ত প্রথম স্থাপিত ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'সাহেব' সাজিয়া বেয়ালা হাতে গান করিতেন,—

"হাম বড়া সাব হ্যায় ছনিয়ামে,
None can be compared হামারা সাথ।"

ঐ অভিনয়ের পর, অর্দ্ধেন্দুকে লোকে 'সাহেব' বলিত। Album of amusement এ ইংলণ্ডের এক কলাবিদ্যানিপুণ ব্যক্তির উল্লেখ আছে। তিনি Lecture on heads বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেন। ঐ সুযোগ্য অভিনেতা কতকগুলি পিস-বোর্ডে নরমুণ্ড প্রস্তুত করিয়া একা রঙ্গমঞ্চে দেখাইতেন। সেই পিসবোর্ডে নির্ম্মিত মুণ্ডগুলির নানারূপ মুখভঙ্গী ছিল। তিনি এক একটী মুণ্ড লইয়া নিজে মুখভঙ্গী পূর্ব্বক সেই মুণ্ডের অনুকরণ করিতেন এবং বলিতেন এই মুণ্ড যাহার ছিল, সে এইরূপ প্রকৃতির লোক,—নিজে তিনি সেই কল্পিত প্রকৃতির অভিনয় করিতেন। দর্শকের উচ্চ হাস্যে রঙ্গমঞ্চ যেন ফাটিয়া যাইত। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তাঁহার প্রশংসা ধরে না। ঐ

ব্যক্তিরও শক্তি অর্দ্ধেন্দুর শক্তির নিকট নিম্নস্তরের। ইংলণ্ডের John Lawrence Tool এই শক্তির পূর্ণবিকাশ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অর্দ্ধেন্দুকে দর্শক অর্দ্ধেন্দু দেখিতেন। অর্দ্ধেন্দু এই অংশে বা ঐ অংশে এ লইয়া বিচার নয়, অর্দ্ধেন্দু বাবু চমৎকার—এই কথা।

অর্দ্ধেন্দুর এই উচ্চ প্রশংসা (প্রশংসা কেন, প্রশংসা বলিলে যেন কিছু বাড়াইয়া বলিতেছি বোধ হয়) অর্দ্ধেন্দুর এই স্বরূপ বর্ণনায় কাহারও বা মনে হইতে পারে, যে এরূপ অভিনয়ে নাটক বর্ণিত চরিত্রের সম্পূর্ণ অভিনয় হয় না। ঐরূপ মনে করা ভ্রম। কলাবিদ্যা—কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। চিত্রকর যখন কোন স্বভাব-দৃশ্য অঙ্কিত করিতে চান, সেই দৃশ্যের অনেক বাদ দিয়া, অনেক যোগ করিয়া, তাঁহাকে চিত্রাঙ্কন করিতে হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যে দৃশ্য অঙ্কিত করিতেছেন, স্বভাবে সেই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকরের যেরূপ মনের ভাব হইয়াছিল, সেই ভাবটী যতদূর পারেন, তুলিতে তোলেন। কল্পনাপ্রসূত দৃশ্যেও অনেক যোগ করিতে হয়। Art gallary তে Approaching Storm অর্থাৎ ঝড় আসিতেছে, এই নামে একখানি ছবি আছে। ঘোর মেঘ উঠিয়াছে, বৃক্ষ সকল স্পন্দনহীন, পশুপক্ষী ভয়াকুল, ঝড়ের পূর্ব্বে এই দৃশ্য স্বভাবে দেখা যায়। চিত্রকর সেই দৃশ্য আঁকিয়া তাহাতে কতকগুলি চাষা, পথিক, গাভী প্রভৃতি দিয়াছেন। ঝড় আসিবার পূর্ব্বে যেখানে সেখানে চাষা, গাভী প্রভৃতি দেখা যায় না। কিন্তু চিত্রকর তাঁহার চিত্রপটে উহা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার

অঙ্কিত মেঘ ও স্পন্দনহীন বৃক্ষ অপেক্ষা অঙ্কিত মানবের মুখভাবে ঝড়ের আশঙ্কা বেশী প্রতীয়মান হইতেছে। অর্দ্ধেন্দু উচ্চ কলা-বিস্তাবলে তাঁহার অভিনীত অংশে চিত্রকরের ন্যায় কতকগুলি কল্পিত হাবভাব দ্বারায় নাটককারের চরিত্র পরিপুষ্ট করিতেন। বর্ণিত চিত্রকরের Approaching Storm ছবিতে আমরা ছবি দেখি, কিন্তু ঝড় আসিবার ভাব মনে উদয় হয়; অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে সেইরূপ আমরা অর্দ্ধেন্দুকে দেখি, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটক বর্ণিত চরিত্রের ঠিক ভাব উপলব্ধি হয়। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে অভিনয়ে Natural কথা ব্র্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমঞ্চই, তাহার দৃশ্যগুলিও রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য। অঙ্কিত দৃঢ় দুর্গ,—বাতাসে নড়ে, কিন্তু অভিনেতা বলিতেছে, "এই দৃঢ় দুর্গ কামানের গোলায় ভেদ করিতে পারিলাম না।" অভিনেতা তাহার শক্তির দ্বারা দর্শকের মনে প্রকৃত ঘটনায়, একজন সৈন্যাধ্যক্ষ খেদ করিয়াছে, সেই ভাব উদ্রেক করিয়া দেয়। এই পর্য্যন্ত অভিনয়ের শক্তি।

স্থূলকায় প্রবন্ধ ব্যতীত অভিনয় কি, বুঝান যায় না। আমি অর্দ্ধেন্দুর শক্তি স্পর্শ করিলাম মাত্র, সুযোগ অভাবে কিছুই পরিচয় দিতে পারিলাম না। মিনার্ভার সত্ত্বাধিকারী মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় অর্দ্ধেন্দুর স্মৃতিসভার আয়োজন করিতেছেন। যদি সুযোগ হয়, অভিনয় সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিবার প্রয়াস পাইব। মনোমোহন বাবু বলেন যে যখন তিনি থিয়েটার ব্যবসায়ে

করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা করা তাঁহার সম্পূর্ণ অভিলাষ। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। নিঃস্ব অভিনেতৃগণ, যাঁহারা বক্ষের শোণিত দানে রঙ্গভূমির উন্নতি সাধনে তৎপর হইয়া ছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া দিবার জন্য যে একজন ব্যক্তিও উদ্যোগী, ইহা অভিনেতৃগণের ভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অন্যের অভিনয়ের সহিত অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ের পার্থক্য কি? তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত হইব। লোকে "গ্যারিকের" অভিনয় দেখিয়া আসিয়া বলিত, হ্যাম্‌লেট চমৎকার হইয়াছে। এ অভিনয় একরূপ। উল্লিখিত John Lawrence Tool নামক অভিনেতার দর্শক-মনোমোহন অভিনয় অন্যরূপ। এই কলা-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতকে দেখিয়া, দর্শক সেই পণ্ডিতেরই নাম করিত; অভিনীত অংশের নাম করিত না। অর্দ্ধেন্দুর আর একটী শক্তি ছিল, অভিনয়কালীন নাটকের কথায়, নিজ মস্তিষ্ক-প্রসূত কথা উপস্থিত যোগ করিয়া দিতে পারিতেন; যথা মুকুল মুঞ্জরায় "বরুণ-চাঁদের" ভূমিকায় বরুণচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া যখন রাজা বলিতেছে —'এ কে ভাঁড় না কি?" তখন অর্দ্ধেন্দু-বরুণচাঁদ উত্তর করিল,— "মহারাজ, ভাঁড়—অত বড় নই—আমি একখানি খুরি।" ইহা নাটকের কথা নয়। কিন্তু শ্রবণমাত্র যে হাস্যের রোল উঠিল, তাহা যিনি শুনিয়াছেন—তিনিই জানেন। সামান্য অভিনেতার অর্দ্ধেন্দুকে এস্থলে অনুকরণ করিতে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক। অর্দ্ধেন্দুর নিকট শিক্ষিত না হইয়া, তাহার ন্যায় ঢং করিতে গেলে ভাঁড়াম হইয়া উঠে। অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিলাম—তাহা

হাস্যরস সম্বন্ধে। গম্ভীর ভূমিকাতেও তাঁহার সমদক্ষতা ছিল কিন্তু গম্ভীর ভূমিকা লইয়া তিনি বাহির হইলে, দর্শক প্রথমে সে অংশের গাম্ভীর্য্য ধরিতে পারিত না। অবশ্যই পরিশেষে সে ভূমিকার প্রকৃত পরিচয় পাইত এবং যেরূপ হাস্যরসাত্মক অংশে হাসিত, করুণ রসাত্মক অংশেও কাঁদিত।

সময় ফুরাইয়া আসিল, আমি বাধ্য হইয়া সমাপ্ত করিতেছি। কিন্তু একটী বক্তব্য কাহারও কাহারও ধারণা যে আমরা উভয়ে উভয়ের বিরোধী ছিলাম। এ ভুল অর্দ্ধেন্দুর একটী কথায় দূর হইবে। অর্দ্ধেন্দু অনেকবার বলিয়াছেন, যে গিরিশ ঘোষ যদি আগে মরে, তাহা হইলে আমি ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই, আর আমি যদি আগে মরি, সে ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই। আমরা অনেক সময়ে একত্রে ও অনেক সময়ে বিরোধী থিয়েটারে কার্য্য করিতাম। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু-গুণমুগ্ধ যিনিই থাকুন, যিনিই যত তাঁহার প্রশংসা করুন, যিনিই যত অন্তর হইতে বলুন, যে অর্দ্ধেন্দু স্বর্গগত হওয়ায় বঙ্গরঙ্গালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা যদি বেশী না হই, অন্ততঃ আমি তাঁহাদের সমান অর্দ্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ, একথা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি।

অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যু হঠাৎ, জোড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে হয়। অর্দ্ধেন্দুভক্ত নরেন্দ্রনাথ জোর করিয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখেন। বুধবার অর্দ্ধেন্দুকে সকলে একটু ভাল দেখিয়াছে, আশা হইয়াছে—

আরোগ্য লাভ করিবেন। বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বেনারস যাইবেন। বায়ু পরিবর্ত্তনে যাওয়া সম্বন্ধে আমার অমত ছিল।—অর্দ্ধেন্দুকে সুস্থ দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ব্যোমকেশ মিনার্ভা থিয়েটারে আসিয়াছে। আমি বাবাজীকে একরূপ ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছিলাম, যে কদাচ অর্দ্ধেন্দুকে লইয়া স্থানান্তরে যাইও না। রোগী বহুদিন ভুগিলে আপনার ইচ্ছায় চলিতে চায়, তুমি সঙ্গে থাকিলেও অত্যাচার করা সম্ভব। তাহাতে ব্যোমকেশ বাবাজী উত্তর করে, যে তিনি যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহাকে ফেরান আর সহজ নয়। আজ বুঝিতেছি যে সত্যই সহজ নয়। সেইদিন রাত্রি ১টার সময়, যখন এই কথা হইতেছে, তখন পথিক অজানিত পথে গমন করিয়াছেন। চিরদিন আনন্দ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, যম তাঁহাকে তাড়না করিতে পারে নাই। মৃত্যুকালে যজ্ঞোপবীত হস্তে গঙ্গাজল চাহিয়া লইয়া শাস্ত্রমতে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। অর্দ্ধেন্দু এক্ষণে উচ্চস্থানবাসী, ইহজগতে আর নাই।

কেহ কেহ বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত হয়তো বলিতে পারেন যে, অর্দ্ধেন্দুবাবুর সম্বন্ধে যদি এত কথা, থিয়েটার বন্ধ দিতে পারিলেন না? যদি এরূপ কেহ থাকেন, তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া আমার নিবেদন, যে যাঁহাদের নিকট অর্দ্ধেন্দুর নাট্যানুরাগ পরিচিত, তিনি বুঝিবেন—যদি ইহা উইল করিবার হইত, তাহা হইলে অর্দ্ধেন্দু উইল করিয়া যাইতেন, যে যেন

আমার মৃত্যুর দিন অভিনয় রজনী না হইলেও অভিনয় করা হয়। রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়, এই তাঁহার চিরকামনা ছিল। মিনার্ভা থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে ইহা জানিতেন ও সকলে অর্দ্ধেন্দুর চিরকামনা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করিয়া দেওয়ায় অভিনয় বন্ধ হইল না। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে রঙ্গালয় প্রিয় ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধেন্দু সর্ব্বাগ্রগণ্য। রঙ্গালয় তাঁহার জীবন ছিল, রঙ্গালয়ের কথা তাঁহার কথা ছিল, রঙ্গালয়ে দীক্ষাদান তাঁহার কার্য্য ছিল, রঙ্গালয় তাঁহার আবাস ছিল, নাট্যামোদী ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার অন্য আত্মীয় ছিল না। সমাজ অভিনয় দেখিতে ভালবাসে, রঙ্গালয়ে অভিনেতার প্রশংসা করে, আদর করে, কিন্তু বাহিরে কেহ কেহ বা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে অভিনেতা বলিয়া পরিচয় দেওয়া একরূপ কঠিন হয়। কিন্তু রঙ্গালয়বৎসল অর্দ্ধেন্দু রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়া অবধি দম্ভভরে পরিচয় দিতেন, আমি অভিনেতা। সে কলাবিদ্যা-গর্ব্বিত—কলাবিদ্যাবিশারদ অর্দ্ধেন্দু আজ নাই!

অবশ্যই পাঠক বুঝিয়াছেন যে, অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র বর্ণনায় রঙ্গালয়ে যাঁহারা তাঁহার সহযোগী এবং যাঁহাদের সংস্রবে তাঁহার অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহাদের নামের যোগ্য উল্লেখের স্থান পাই নাই। অর্দ্ধেন্দুর প্রতিভা কিরূপে বিকশিত তাহাও কিছু বলি নাই। বাল্যকালে তাঁহার অনুকরণ-

শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা অতি সামান্য। যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি অর্দ্ধেন্দুকে পূর্ব্বকথিত Morning Schoolএ দেখিতেন, হয় তো তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার আভাস পাইতেন। School বসিবার অগ্রে ও স্কুল ভাঙ্গিলে বালকেরা আগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট কিয়দংশ নিম্নোদ্ধৃত গানটী শুনিতেন ঃ—

Birds are free so are we
And we live as merrily
Merrily merrily merrily
&c. &c. &c.

সে সময় হাস্যজনক গল্পও অনুকরণ হইত। অর্দ্ধেন্দুর নিকট বালকেরা আমোদপ্রার্থী ছিল। বাল্যকালে তাঁহাকে তাঁহার পিতৃষ্বসা, মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জননী, তাঁহার পাথুরিয়াঘাটা ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহনের অশেষ গুণরাশির মধ্যে নাট্যামোদে উৎসাহ প্রদানে বিশেষ অভিরুচি ছিল। রাজবাটীতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া অভিনয় হইত, অর্দ্ধেন্দুর তাহা দেখিবার সুযোগ ছিল। গণ্য ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণের সে সুবিধা ছিল না। মাইকেল তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভূমিকা(Preface)য় যে পূজনীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া 'নটকুলচূড়ামণি' বলিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধাস্পদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, রাজবাটীর নাট্য সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। নাটকের মহলাও অর্দ্ধেন্দু ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতেন। অনুকরণপ্রিয় অর্দ্ধেন্দু যে কেবল

শুনিতেন ও দেখিতেন, তাহা নয়, বাল্যহৃদয়ে তাহা অঙ্কিত হইত। যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও বহুবিবাহ নিন্দা করিয়া "নব নাটক" অভিনীত হয় ; অভিনয়-পারদর্শী অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার সেই অভিনয়ের নায়ক। এই নাটক অভিনয় দেখাও অর্দ্ধেন্দুর পক্ষে সহজ ছিল। 'বিশ্বকোষে' লিখিত আছে যে, এই অভিনয় দৃষ্টে অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। দেখিবার, জানিবার, শিখিবার আর কিছু বাকী রহিল না। এ স্থলে "বিশ্বকোষ" ভ্রান্ত।

পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর "মালবিকাগ্নিমিত্র, বিদ্যাসুন্দর, যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল, বুঝ্‌লে কি না ? মালতীমাধব, উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান, রুক্মিণীহরণ, রসাবিষ্কারবৃন্দক" ও জোড়াসাঁকোর "নব নাটক" দেখিয়া যে নটের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ইহা যিনি নটের শিক্ষায় কি প্রয়োজন, তাহার কিছুমাত্র আভাস পাইয়াছেন, তিনি সাদা কাগজে লিখিবেন না। নটের কার্য্য To give the airy nothing a local habitation and a name অর্থাৎ বায়ুনির্ম্মিত আকাশকুসুমকে নাম ও ধাম দেওয়া নটের কার্য্য। কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। বাহ্যিক ও আন্তরিক সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য্য হয় না, যে অংশ অভিনয় করিবে, তাহা নট বুঝিতে পারে না। "বিশ্বকোষ" উল্লিখিত শিক্ষা ভিন্ন অর্দ্ধেন্দুশেখরের অপর শিক্ষার নিশ্চয় প্রয়োজন হইয়াছিল।

অর্দ্ধেন্দু কদাচ প্রশংসাভাজন হইতেন না; Macbeth এর witch প্রভৃতির অভিনয় করা সামান্য শিক্ষার কার্য্য নহে।

শনিবার রাত্রে বলিয়াছি "কিছু কিছু বুঝি"তে অর্দ্ধেন্দু অভিনয় করেন, সেই তাঁহার প্রথম রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ। উক্ত শ্লেষ প্রহসণে তাঁহার তিনটী অংশ ছিল। তাহার একটী অংশ রাজবাটীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিদ্রূপ। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতৃস্বসা-গৃহে বিরক্তিভাজন হন; তাঁহার পিতা তাঁহাকে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্যামোদী অর্দ্ধেন্দু ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাতে তাঁহাকে পিতৃস্বসার গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে বাগবাজারে আসিয়া 'সধবার একাদশী' সম্প্রদায়ে যোগ-দান করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার সহিত আমার সংস্রব। বলিয়াছি অনেক সময় একত্রে ও অনেক সময় স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতাম। যে সময়ে একত্র কার্য্য করিতাম, সে সময়ে প্রহসন ও নবীন তপস্বিনী এবং নয়শো রোপেয়া নাটক ভিন্ন বহুদিন অবধি সকল নাটকেই আমাদের উভয়ের ভূমিকা (part) থাকিত। সুতরাং প্রত্যেক নাটকের মহলা হইতে প্রকাশ্য অভিনয় পর্য্যন্ত দেখিয়া অর্দ্ধেন্দুর শক্তি ও শিক্ষা বুঝিবার প্রয়োজন আমার হইত। যে সম্প্রদায়ে আমরা একত্রে অভিনয় করিতাম, সে সম্প্রদায়ের সাধারণের নিকট দায়িত্ব আমারই থাকিত।

জীবনী লিখিতে গেলে, লেখকের আত্মগোপন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহিত আমার নাট্যজীবনের এত সংস্রব, যে সকল স্থানে আমার পশ্চাতে থাকা অসম্ভব। অতএব যদি

আত্মপ্রকাশ দেখিতে পান, পাঠক মার্জ্জনা করিবেন, জানিবেন তাহা অনিচ্ছাসত্বেও করিতে হইয়াছে। যাঁহারা রঙ্গালয়ের কথা আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্দ্ধেন্দু ও আমাকে লইয়া বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের বাদানুবাদ লইয়া থাকেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই,—ও এতদিন ছিল না। কিন্তু সত্য ঘটনা লিখিতে গেলে, কাহারও বা বাদের প্রতিবাদ হইতে পারে। তিনি মার্জ্জনা করুন বা না করুন, কিন্তু সত্যপ্রিয় পাঠক বুঝিবেন, সত্য ঘটনা লিখিতে আমি বাধ্য।

"সধবার একাদশী" শেষ হইল। লীলাবতীর অভিনয় আরম্ভ হইল। এ সম্প্রদায় স্থাপনে আমার একজন পূর্ব্ববঙ্গীয় বন্ধু উদারচেতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ উৎসাহী। তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ না থাকিলে সম্প্রদায় স্থাপিত হইত না, তাঁহারই অর্থব্যয়ে আকড়া খরচ চলিত। বহুদিন লীলাবতীর আকড়া চলে। প্রথমে তথায় আমার বেশী যাতায়াত ছিল না, কিন্তু শেষে বাধ্য হইয়া বিশেষরূপে যোগদান করিতে হয়। চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ও সাধারণীর সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইয়া "লীলাবতীর" সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের সুখ্যাতি অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইল। বাগবাজারে 'লীলাবতী' বসিয়াছে বটে, কিন্তু সকল অংশই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। যদিও অনুরূপ কারণ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাই,

আমার যোগদানের স্বরূপ কারণ বলিতে আমায় বাধ্য হইতে হইয়াছে। উল্লিখিত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিভাশালী ষ্টেজ ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর—সমবেত হইয়া আসিয়া অর্দ্ধেন্দু আমার নিকট বলেন,—"চুঁচুড়ার দলের নিকট হারিয়া যাইব, তুমি কি বসিয়া দেখিবে?" অর্দ্ধেন্দুরই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ অনুরোধ। নাট্যকার দীনবন্ধু বাবু, তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন, "তোমরা পারিবে না।" অর্দ্ধেন্দুর এরূপ আগ্রহ কেবল যে আমাকেই লইবার জন্য ছিল, তাহা নহে। অর্থবলহীন সম্প্রদায়ে বালক সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। নগেন্দ্রনাথ, অর্দ্ধেন্দু, ধর্ম্মদাস প্রভৃতি বহু কষ্ট ও লাঘবতা স্বীকার করিয়া এই কার্য্য করিতেন। এ সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য আমার এই, যে 'বিশ্বকোষে' আভাস পাই যেন এ সময় অর্দ্ধেন্দু আমার বিরোধী। না, তাহা নহে—আমরা একত্রেই উদ্যোগী। ন্যাসান্যাল থিয়েটার কি নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ বর্ণনা বক্তৃতা বা লেখায় পাই না। অর্দ্ধেন্দুর জীবনীতে তাহা আবশ্যক, এই নিমিত্ত "লীলাবতীর" প্রসঙ্গ স্থানোপযোগী। "লীলাবতী" অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধু বাবু আমায় বলিয়াছিলেন, "তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া দলের তুলনাই হয় না,—আমি পত্র লিখিব—"হুয়ো বঙ্কিম!" সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺কানাইলাল দে, ঠাকুর বাড়ীর অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের নিকট

প্রকাশ করেন যে, তিনি তথায় বলিয়া আসিয়াছেন,—"আপনাদের অভিনয় সোনার খাঁচায় দাঁড়কাক পোরা"।

আমি অর্দ্ধেন্দুর "হরবিলাসের" সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত; দৃশ্যপটগুলি ধর্ম্মদাস বাবুর তুলিতে অঙ্কিত, সামান্য চাঁদার অর্থে কার্য্যসম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু অভিনয়ের সুখ্যাতি এত বিস্তৃত, যে দলে দলে লোক টিকিটের জন্য উমেদার। যদিচ বৃহৎ প্রাঙ্গণ, তথাপি স্থানাভাবে বহু টিকিট প্রার্থীকে বঞ্চিত করিতে হইত। এ অবস্থায় টিকিটের দাম করা যাক, প্রস্তাব হইল; এবং এই প্রস্তাবই ন্যাসান্যাল থিয়েটার স্থাপনের ভিত্তি। কিছুদিন পরে নীলদর্পণের রিহারস্যাল বসিল। পূর্ব্বে যাঁহারা থিয়েটার অগ্রাহ্য করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পৃষ্ঠপোষক হইলেন। নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন,—যে সকল নিয়মাবলী ব্যতীত "সধবার একাদশী" ও "লীলাবতী" সুন্দররূপে অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

নীলদর্পণের শিক্ষা-সম্বন্ধে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক শুনিতে পাই ও মুদ্রাঙ্কিত কাগজ দেখিতে পাই। সেই সব কাগজ ও কথার বিশেষ যত্ন, যাহাতে প্রতীয়মান হয় যে নীলদর্পণের রিহারস্যালে আমার কোন হস্তক্ষেপ ছিল না, কেবল অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষাতেই সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। আমার সংস্রব ছিল বা না ছিল, তাহা জানাইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু নীলদর্পণ সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, এ কথায় অর্দ্ধেন্দুর বিশেষ প্রশংসা হয়

না। কারণ উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ দুইবার অতি উচ্চ প্রশংসার সহিত 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী' অভিনয় করিয়াছে। নীলদর্পণে নাটককারের কৃতিত্ব 'লীলাবতীর' অপেক্ষা অধিক হইলেও 'লীলাবতীতে' নীলদর্পণ অপেক্ষা অধিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। যাঁহারা লীলাবতী অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে চাষার শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইত, কারণ কঠিন কঠিন ভূমিকা সাবিত্রী, উড, গোলক বসু প্রভৃতি অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'লীলাবতীতে' সম্প্রদায় যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে নবীন মাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি ভূমিকার অধিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। যথা 'লীলাবতীর' শ্রীনাথের পক্ষে নীলদর্পণের দাওয়ান বিশেষ কঠিন নয়। নীলদর্পণে আমার কোন সংস্রব ছিল না, ইহা প্রমাণ করিয়া যিনি অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিশেষ প্রশংসার চেষ্টা করিবেন, তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হই-বেন না। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহিত নীলদর্পণের শিক্ষার অংশ না হোক্, সধবার একাদশী ও লীলাবতী শিক্ষার দাবী শ্রীযুক্ত রাধামাধব করও রাখেন। নীলদর্পণ শিখাইবার অংশ অদ্যা-বধি জীবিত ধর্ম্মদাস বাবু আমাকে কাগজ-কলমে দেন। নীল-দর্পণ সম্প্রদায়ের অনেকেই মহেন্দ্রলাল, মতিলাল, কাপ্তেন বেল, শিবচন্দ্র প্রভৃতি আজীবন আমাকে গুরু বলিয়া গৌরব করিতেন। যাঁহার অপর প্রশংসা নাই, তাঁহার পক্ষপাতী ব্যক্তি যদি সত্যের
যাঁহার প্রশংসা বৃদ্ধির প্রয়াস পান, তাহাতে ফল

না হোক্, কতক পরিমাণে মার্জ্জনীয় হইতে পারে। 'নীলদর্পণ' লইয়া আমার সহিত অর্দ্ধেন্দুর বিবাদ কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা অমূলক। ন্যাসানাল থিয়েটার স্থাপনের কর্ত্তৃত্বভার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর ও ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অল্প ছিল না। নগেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের শিক্ষাও দিতেন। কতকটা ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুও এ কর্ত্তৃত্বের দাবী রাখেন। তিনি এই নীলদর্পণে 'লীলাবতীর' ক্ষীরোদবাসিনী চলিয়া যাওয়ায় সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা পান ও এই তাঁহার প্রথম নাটক শিক্ষা। যে সময়ে অমৃত বাবু নীলদর্পণে যোগ দেন, সে সময়ে আমি না থাকিবার কারণ-কোনও বিবাদ নয়, মতের অনৈক্য মাত্র। আমার রচিত গান "লুপ্তবেণী বইছে তিরোধার" তাহার প্রমাণ। গানের শ্লেষ এই—"স্থান মাহাত্ম্যে হাড়ী শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।" ন্যাসানাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাসানাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্নজাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাসানাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে—এই আমার আপত্তি। ন্যাসানাল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র

জ্ঞান হইল। এই মতভেদ। কিন্তু সে সময় টিকিট বেচিয়া টিকিটের অর্থ আত্মসাৎ করিবেন, এমন দুই একব্যক্তি পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। তাঁহারাই এই মতভেদকে শত্রুতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাস্তবিক শত্রুতার কোন কারণ ছিল না। ন্যাশান্যাল থিয়েটারের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বলিয়াছি, তখন আমার সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু যখন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইয়াছিল, তখন আমায় যোগ দিতে হয়। ভীমসিংহের ভূমিকা আমার উপর অর্পিত হইল। বর্ণিত মতভেদ এই সময় কিছু বিস্তৃত হইয়া বিচ্ছেদের আকার ধারণ করে। আমি আমার নাম Amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত না হইলে, অভিনয় করিতে অসম্মত হই। অর্থলোভী ব্যক্তিরা আমার যোগদানে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না, এই আশঙ্কায় ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে আপত্তি করিলেন। অর্দ্ধেন্দুকেও সে আপত্তি বুঝাইতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্তরূপ বিজ্ঞাপিত না হইয়া আমি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে একান্ত আপত্তি করায় ভীমসিংহ—By a distinguished amateur প্লাকার্ডে প্রকাশিত হয়। বর্ষা আগমনে জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়ীর প্রাঙ্গণে অভিনয় করা অসম্ভব হওয়ায় ন্যাসান্যাল থিয়েটার বন্ধ হয়। প্রকৃত বিবাদ এই সময়। অর্জ্জিত অর্থ কোথায় থাকিবে, সাজ-সরঞ্জাম কে রাখিবে?——বিবাদ এই লইয়া। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিবাদ নয়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিবাদ, বক্তৃতা ও কাগজ-কলমে বহুবার প্রকাশিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন কারণই ছিল না। যে যে

নাটক আমরা একত্রে অভিনয় করিয়াছি, প্রত্যেক নাটকেই আমার নায়কের (Hero) ভূমিকা এবং অর্দ্ধেন্দুর হাস্যরসোদ্দীপক ভূমিকা ছিল। "নীলদর্পণ" দেখিয়া গিয়া দীনবন্ধু বাবু স্বয়ং আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে ইহাতে একজন যোগ্য গম্ভীর অংশের (Serious part) actor যোগদান করে নাই। ভিন্ন রসের অভিনয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। অমূলক সংবাদের প্রতিবাদ অর্দ্ধেন্দুর জীবনীর উপযোগী বিবেচনায় স্বরূপ বর্ণনা করিলাম।

বিবাদ মীমাংসা হইল না, দুইটী দল হইল। দুই দলেরই ইচ্ছা মফঃস্বলে অভিনয় করে। এক দলে অর্দ্ধেন্দু আর এক দলে আমার থাকা না থাকা সমান, কারণ নানাস্থানে বেড়াইবার আমার শক্তি, সুযোগ ও ইচ্ছা ছিল না। ৺রাজেন্দ্রলাল নিয়োগী দ্বিতীয় দলের প্রকৃত পরিচালক, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর সেই দলে ছিলেন। যে দলে অর্দ্ধেন্দু ছিলেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুও সেই দলে। অবশেষে দলভেদের মর্ম্ম উভয়ে অস্থিতে অস্থিতে বুঝিয়াছিলেন। দলের পরিচালক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের অর্থ-পিপাসায় ন্যাসান্যাল বিভক্ত হইয়া যায়, একথা মধ্যে মধ্যে আজও আলোচিত হইয়া থাকে।

ন্যাসান্যাল থিয়েটারের পরিচয় ও অর্দ্ধেন্দুর কৃতিত্বের বিষয় পাঠককে কতক পরিমাণে অবগত করিয়াছি। তৎপরে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থব্যয়ে, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুরের শিল্পনিপুণতায় গড়ের মাঠে লুইস থিয়েটারের অনুকরণে গ্রেট

প্রস্তুত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীতে থিয়েটার বাটীর সম্মুখভাগে হঠাৎ সামান্য আগুন ধরে,তাহাতে অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। গ্রেট ন্যাসান্যালে প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিনয় "সতী কি কলঙ্কিনি?" প্রারম্ভে আমার তত্ত্ব হয় নাই, ক্রমে তৎকালে প্রকাশিত অভিনয় যোগ্য নাটকসকল পুরাতন হইয়া আসিল, তাহাতে আর অর্থাগম হয় না। আবার আমার প্রয়োজন পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সকল নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয় চলিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Pantomimeয়েরও আবশ্যক হইল। একদিন এক রজনীর জন্য বুধবারে চারি পাঁচখানি প্যাণ্টোমাইম বিজ্ঞাপিত হইল, শনিবারে অভিনয় হইবে—কিন্তু Pantomime এক খানিও প্রস্তুত নাই। শুক্রবার রাত্রি ৩টার সময় অপর পঞ্চরং গুলি এক রকম হইল, কিন্তু 'মাউসি' নামে একখানি বিজ্ঞাপিত প্রহসন লিখিবার সাবকাশ রহিল না। স্থির হইল আমি, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অভিনেত্রী শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি তিনজনে মিলিয়া অভিনয় করিব। অভিনয় হইল,—অর্দ্ধেন্দুর কৃতিত্ব সমান প্রস্ফুটিত রহিল। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মহলা দেওয়া ব্যতীত কিরূপে ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইত? পঞ্চরংই হইল, তাহারও তো মহলা দেওয়া প্রয়োজন? এরূপ বিস্ময় জন্মিতে পারে, কারণ পাঠক জানেন না, যে ন্যাসান্যাল থিয়েটার হইতেই প্রম্‌টার নামে একজন নেপথ্যে অভিনয়কারী সৃষ্টি হইয়াছে। প্রম্‌টারের বলেই ন্যাসান্যাল থিয়েটারে নূতন নূতন নাটক

তাহা আজও চলিতেছে। তবে অর্দ্ধেন্দুশেখরের অদ্ভুত নৈপুণ্যে সে সময়ে সকল দোষ চাপা পড়িত।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে অর্দ্ধেন্দুশেখর গ্রন্থকারের কথায় যোগদান করিয়া নাটকের উৎকর্ষ সাধন করিতেন। একটী দৃষ্টান্ত দিই,—নাটকে জলধর কবিতা রচনা করিয়াছেন ;—

"মালতী মালতী মালতী ফুল
মজালে মজালে মজালে কুল।"

জলধর-অর্দ্ধেন্দু কবিতার এক ছত্র রচনা করিয়াছেন—

মালতী মালতী মালতী ফুল

মিল-শুদ্ধ দ্বিতীয় ছত্র আর হইয়া উঠিতেছে না—নানাপ্রকার চেষ্টা হইতেছে, বহু কষ্টে দ্বিতীয় ছত্র রচিত হইল—

"বিঁধেছে পাপ্‌ড়িতে বোল্‌তার হুল"

কিন্তু ছত্রটী জলধরের মনোনীত হইতেছে না। কারণ 'পাপ্‌ড়ী' এ কথাটী 'বিঁধেছে'র দিকে দেওয়া যায়, কি বোল্‌তার হুলের দিকে দেওয়া যায়? এই পাপ্‌ড়ি এদিকে কি ওদিকে দেওয়া যাইবে, ইহার আলোচনা পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল। পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে—উঁহুঁ জলধরের মনোনীত হয় না। শেষে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় মনে উঠিল,—

মজালে মজালে মজালে কুল।

যখন পাপড়ি লইয়া ব্যাকুল, তখন দর্শক হাসিয়া আকুল। 'নয়শো রোপেয়ার' ছাতুলাল, সধবার একাদশীর নিমচাঁদের

অনুকরণ। নিমচাঁদ মূর্খ ও গাঁজাখোর হইলে যেরূপ হওয়া সম্ভাবনা, ছাতুলাল তাই। এ গাঁজাখোর নিমচাঁদের ন্যায় হৃদয়বান ও উচিত বক্তা, নিমচাঁদের মদের গ্লাসের ন্যায় গাঁজার হুঁকো হাতে করিয়া অভিনয় করিতে হয়। অর্দ্ধেন্দু-ছাতুলালের গাঁজার কল্কে হইতে হঠাৎ আগুন পড়িয়া গেল। এই—যাহার সহিত অভিনয় হইতেছিল, তাহার প্রতি ছাতুলালের তাড়না,—"হামারা পা পুড়িয়ে যাতা হায়, তোম্ দেখ্‌তা নাই?" তাড়িত অভিনেতা অবাক! তাহার ভূমিকায় (part) তো এরূপ কোন কথা নাই। ছাতুলালের তাড়না বাড়িল, সে পলাইবার চেষ্টা করে, তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া অভিনয় চলিল। এরূপ দিন দিনই উদাহরণ পাওয়া যাইত। "কৃষ্ণকুমারীতে" ধনদাসের অংশে উচ্চহাস্যোদ্দীপক কথা কিছু নাই। অভিনয় করিতে করিতে অর্দ্ধেন্দু কিছু বিরক্ত। রঙ্গমঞ্চে বরেন্দ্রসিংহ আছে, মরুদেশের রাজার দূতের সহিত ধনদাসের বাদানুবাদ চলিতেছে, বরেন্দ্র সিংহ উভয়কে উৎসাহ দানে বাদানুবাদ বাড়াইতেছেন। ধনদাস-অর্দ্ধেন্দু দেখিলেন, তেমন হাসিতো হয় না;—আর মরুদেশের দূত কোথায় যাইবে, মাথায় দুই থাপ্পড়! মরুদেশের দূত তো রাগিয়া প্রস্থান করুন, বরেন্দ্র সিংহ অবাক্ হইয়া দাঁড়ান, জয়লাভ করিয়া ধনদাস কলাপাতার ভেঁপু পোঁ করিয়া ফুঁকিয়া বিজয় ঘোষণাপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। অনেকে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন যে এরূপ ভাল নয়। কিন্তু ধনদাসের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত, যেরূপ তাহাকে রাস্তায়

রাস্তায় ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, তাহাতে এ বর্ব্বরতায় চরিত্র অনুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ধনদাসের ভূমিকা বটে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু ধনদাস, ইহা প্রকাশ পাইল। এরূপ করায় কখনও যে ক্ষতি না হইত, তাহা নয়, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু দর্শকের এতদূর প্রিয় ছিলেন, যে ক্ষতি বৃদ্ধি গণ্য হইত না। আমোদের স্থলে আমোদই হইত।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারের পর অর্দ্ধেন্দু বহু স্থান ভ্রমণ করেন। এই সময়ে বহু নাট্যসম্প্রদায় তাঁহার দ্বারা দীক্ষিত হয়। নড়ালের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত নাট্যসম্প্রদায় গঠন অর্দ্ধেন্দুর এরূপ কার্য্যের শেষ।

দেশ ভ্রমণ করিয়া যে সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, প্রায়ই যে রঙ্গমঞ্চে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত অভিনেতারা থাকিতেন, তথায় যোগদান করিতেন। যখন ৺ প্রতাপচাঁদ জহরী, গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারের অধিকারী হইয়া, ন্যাসান্যাল থিয়েটার নাম দিয়া আমার তত্ত্বাবধানে থিয়েটার চালান, সে সময়ে অর্দ্ধেন্দু বিদেশে। প্রতাপচাঁদকে নূতন দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দলভেদ-কারীর অর্থপিপাসায় পুরাতন দৃশ্যপট ও সাজসরঞ্জমাদি লোপ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ নট ৺ মহেন্দ্রলাল বসুর পর্য্যবেক্ষণে নূতন সরঞ্জাম প্রস্তুত হইল। এই সময়ে আমি পার্কার সাহেবের অফিস পরিত্যাগ করি, এবং রঙ্গালয় আমার উপজীবিকা-স্থান হয়। তদবধি অর্থশোষকেরা দূর হইতে দেখিতেন, রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবার আর উপায় রহিল না। এই সময় হইতে

রঙ্গালয়ের বাহিরে যথাসাধ্য আমার বিপক্ষে শত্রুতা চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। পরে নানা-কারণে প্রতাপচাঁদের সহিত অবনিবনাও হওয়ায় ৺ গুর্ম্মুখ রায়ের অর্থে ষ্টার থিয়েটার স্থাপিত হইল। যথায় এক্ষণে কোহিনুর থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার ঐ স্থানে নির্ম্মিত হয়। সে সময়ে প্রতাপচাঁদ ৺ কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইবার চেষ্টা করেন। অর্দ্ধেন্দুও কেদারনাথের সহিত মিলিত হন। প্রতাপচাঁদের থিয়েটার রহিল না, কেদারনাথের "ছত্রভঙ্গ" নাটক তাহার শেষ অভিনয়।

কিছুদিন পরে ৺ গোপাললাল শীল ষ্টার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করেন। তখন থিয়েটার গুর্ম্মুখ রায়ের নয়, উপস্থিত ষ্টার থিয়েটারের সত্বাধিকারীগণের। ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় ঢাকায় অভিনয়ার্থে গমন করিল। কেদারনাথ পরিচালিত গোপাললাল শীলের অর্থে রঙ্গমঞ্চ পরিবর্ত্তিত ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি অভিনেতাগণ সংমিলিত এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার প্রথম অভিনয় কেদারনাথ বিরচিত—পাণ্ডব-নির্ব্বাসন নাটক। দুই চারি রজনী অভিনয়ের পর গোপাললাল আমায় তাঁহার থিয়েটারে গ্রহণ করিলেন। কেদারনাথের পরিবর্ত্তে আমায় ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। কেদারনাথ চলিয়া গেলেন, অর্দ্ধেন্দুও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

পরে যখন শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন আমি ও অর্দ্ধেন্দু পুনর্ব্বার

একত্রিত হই। মধ্যে তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করেন। মিনার্ভায় প্রথম অভিনয় ম্যাক্‌বেথ—ইহাতে অর্দ্ধেন্দু Porter, Witch, Oldman ও Doctor এই চারিটী অংশ গ্রহণ করেন। এই অভিনয়ে তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। পরে আবুহোসেনে 'আবুহোসেন', মুকুল মুঞ্জরায় 'বরুণচাঁদ', জনায় 'বিদূষক' প্রভৃতি অভিনয়-দক্ষতায় নবশ্রেণীর দর্শক চমৎকৃত ও প্রত্যেক নাট্যামোদীর মুখে অর্দ্ধেন্দুর ভূয়সী ব্যাখ্যা। জনার 'বিদূষক' দুই চারি রজনী অভিনয়ের পর তিনি স্বয়ং সত্ত্বাধিকারী হইয়া থিয়েটার চালাইবেন—এই অভিপ্রায়ে এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লইলেন। কতকগুলি অভিনেতাও তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করিলেন। এইটী অর্দ্ধেন্দুর জীবনে একটী ভ্রম। তিনি অভিনেতা ছিলেন, বিষয়ী ছিলেন না। তিনি শিক্ষা দিতে জানিতেন, কিন্তু কিরূপে সকল দিক সামঞ্জস্য রাখিয়া থিয়েটার চালাইতে হয়, তাহা জানিতেন না। যথা নূতন নাটকের অভিনয়ের তারিখ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সকলকে বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন, বড় বড় অংশ, যাহাতে সর্ব্বাঙ্গিন পুষ্ট হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কোন এক ক্ষুদ্র অংশ ভাল হয় নাই, তাহা কিরূপে সম্পূর্ণ হইবে, তাহারই জন্য বিব্রত। যাহারা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসুক হইলে বিরক্ত, ক্ষুদ্র অভিনেতা কোনওরূপে শিখিতেছে না, অর্দ্ধেন্দু তাহাকে কোনরূপে শিখাইবেনই। যদি কোনও অভিনয়-শিক্ষালয় থাকিত, যথায় ছাত্রেরা শিক্ষিত হইয়া

রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবে, তাঁহার এরূপ শিক্ষাদান প্রশংসার হইত, কিন্তু রঙ্গালয়,—কার্য্য চালাইতে হইবে, অভিনয় রাত্রি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এখন আর সময় অপব্যয় করিবার নয়, ইহা তিনি শিখাইবার জেদে অল্প বুঝিতেন। তাঁহার কার্য্যে কেহ বাধা দিলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন, নিখুঁত না হইলে সে অভিনেতার নিস্তার নাই। এরূপ কার্য্যের ফলাফল তিনি স্বয়ং থিয়েটার করিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিলেন। এই প্রকার নানা বিষয়ে কার্য্যের উপযোগিতা তিনি বুঝিতেন না, এ নিমিত্ত ঋণ-গ্রস্ত হইয়া তিনি থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না।

কবি, নট, চিত্রকর প্রভৃতির প্রায়ই বিষয়বুদ্ধি কম হইয়া থাকে। চিন্তার পাছে বিঘ্ন হয়, এ নিমিত্ত বিষয়ীর সংঘর্ষ প্রায়ই তাঁহারা পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহারা হিসাবের এক পয়সার জন্য বাদানুবাদ করিতে, এক পয়সার জন্য মাসাবধি খাতা উল্টাইয়া রেওয়া মিলাইবার নিমিত্ত বিব্রত থাকিতে, এক পয়সা খরচ কমাইবার জন্য তিন দিন মস্তিষ্ক ঘামাইতে কিছুমাত্র ক্লেশ বিবেচনা করে না; কিন্তু নট প্রভৃতি যাঁহারা কল্পনার পথে দিবারাত্র বিচরণ করেন, তাঁহাদের বিষয়কর্ম্মের ভিতর একবার আহারের চেষ্টা থাকে, তাহা ফুরাইলে আবার কল্পনায় বিভোর হইয়া পড়েন, বৈষয়িক সংসর্গ তাঁহাদের একেবারেই বিরক্তিকর। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনী ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, প্রভাব-শালী আত্মীয়ের বিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াছেন, বাড়ীঘর পুত্র-কলত্র

কিছুরই তোয়াক্কা রাখিতেন না। আহার চলিলেই হইল, তাহার পর যাহা হউক না কেন, থিয়েটার লইয়াই আছেন। কখনও বা যত্নপূর্ব্বক কোনও শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেছেন, কখনও বা নাটকের অংশ লইয়া বাদানুবাদ করিতেছেন, কখনও বা কোন চরিত্রের উপযোগী পরিচ্ছদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতেছেন, কখনও বা কোথায় কিরূপ কোন নাটক অভিনীত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতেছেন, কখনও বা কোন নাটককার, রচিত নাটক লইয়া আসিয়াছে শুনিতেছেন, শ্রোতারা সকলে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া চলিয়া গেল, অর্দ্ধেন্দু অটল ভাবে বসিয়া আছেন, হয়তো গ্রন্থকার পড়িতে ক্লান্ত কিন্তু অক্লান্ত অর্দ্ধেন্দু "পড়ে যাও ভাই!" বলিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, রঙ্গালয়ে আর কেহ কোথাও নাই, এক চেয়ারে গ্রন্থকার অন্য চেয়ারে অচল অটল অর্দ্ধেন্দু, বিরক্তির লেশমাত্র মুখে অঙ্কিত নাই। উপর্য্যুপরি সাতদিন গ্রন্থ পাঠ করিয়াও অর্দ্ধেন্দুর ধৈর্য্য-চ্যুতি করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না। গ্রন্থকারের পাঠ করা শেষ হইয়াছে, এইবার তাঁর বড় বিপদ। অর্দ্ধেন্দু তাহার প্রতি চরিত্র সম্বন্ধে উপদেশ আরম্ভ করিয়াছেন, সে নিজ রচিত চরিত্র সম্বন্ধে বুঝুক না বুঝুক, অর্দ্ধেন্দু পুঙ্খানুপুঙ্খ তাহার নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতেছেন। যদি কোন গ্রন্থকার দুর্দ্দৈব বশতঃ বলিত যে আমার তো এরূপ লেখা নাই, অর্দ্ধেন্দু বলিত, "খোল ভাই তোমার খাতা খোলো।" গ্রন্থকারকে খাতা খুলিতেই হইবে, এবার তাহার আরও বিপদ, তাহার আশঙ্কা আবার অন্যান্য স্থান

খুলিতে বলিবেন, তাহা হইলে আজ আর তাহার বাড়ী ফেরা হইবে না। যদি কেহ অর্দ্ধেন্দুকে বলিত, 'মশায়, ও সব কি শোনেন?" অর্দ্ধেন্দু গম্ভীর হইয়া বলিতেন, "আমরা না শুনিলে উহারা শিক্ষা পাইবে কোথায়?" কোন রং-ঢংয়ের কথা যে কেহ যে সময় শুনিতে চাহিত, অর্দ্ধেন্দু তখনই শুনাইতে প্রস্তুত, দ্বিতীয় বার অনুরোধ করিতে হইত না; রঙ্গরস অর্দ্ধেন্দুর জীবন ছিল। অর্দ্ধেন্দু সমাজে সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন, যথায় বসিতেন, আনন্দের স্রোত চলিত, কিন্তু রিহারস্যালে বসিলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সর্ব্বনাশ। কাহাকে শিক্ষা দিতেছেন, এমন সময় এক কোণে কেহ কাহারও নিকট একটী পান চাহিয়াছে, অর্দ্ধেন্দু অমনি সেইদিকে ব্যাঘ্রের ন্যায় চাহিলেন, যাহাকে শিক্ষা দিতে ছিলেন, তাহাকে বলিলেন "থাম, বাবুদের কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাহা শেষ হোক, তাহার পর কার্য্য হইবে।" কেহ উঠিয়া গেল, পায়ের শব্দ হইয়াছে, অমনি ছাত্রকে বলিলেন, "স্থির হও, আর কে কে উঠিয়া যাইবেন যান, তার পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে কার্য্য আরম্ভ করি।" তাঁহার শিক্ষা প্রদানে এরূপ আগ্রহ ছিল, যে সামান্য বাধাবিঘ্নে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন, কিন্তু যখন রিহারস্যাল ফুরাইল, অতি ক্ষুদ্র অভিনেতাও তাঁহার বন্ধু। বন্ধু ভাবে একত্রে কথাবার্ত্তা, ভোজের আয়োজন, রন্ধনে উপদেশ প্রদান,—এইরূপে বারোমাসের মধ্যে এগার মাস কাটিয়া যাইত। অর্দ্ধেন্দুর থিয়েটারের নিয়মাবলীও কঠিন ছিল, অভিনয়ে নেপথ্যে সৈন্যগণের "আল্লা-আল্লা হো" শব্দ করিবার আবশ্যকতা। নেপথ্যে দুই একজন মাত্র 'আল্লা আল্লা

হো' শব্দ করে, তাহাতে জমাট হয় না। অর্দ্ধেন্দু নিয়ম করিলেন, যখন "আল্লা আল্লা হো" করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন যে যেখানে থিয়েটারে যে অবস্থায় আছ, একবার "আল্লা আল্লা হো" শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই, সকলকে "আল্লা আল্লা হো" শব্দ করিতে হইবে। কেহ হুঁকা হাতে করিয়া "আল্লা আল্লা হো" করিতেছে, কেহ মুখের খাবার ফেলিয়া "আল্লা আল্লা হো" করিতেছে, কাহারও জলের গ্লাস হাতে, কেহ বা বেঞ্চিতে শুইয়া একটু তন্দ্রাবস্থায়, কেহ বা পাইখানায়—সেই অবস্থাতেই "আল্লা আল্লা হো" করিতে হইবে, সাহেব দিব্যি দিয়াছে।

অভিনেতৃগণের প্রতি অর্দ্ধেন্দুর অশেষ দয়া ছিল, প্রয়োজন হইলে যেস্থলে আমরা দুই টাকা যথেষ্ট মনে করিতাম, অর্দ্ধেন্দু পাঁচ টাকা দিতেন। কেহ খাইতে চাহিলে যেরূপে পারেন, তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া খাওয়াইবেন। সামাজিকতায় অর্দ্ধেন্দু আমীর অপেক্ষা আমীর ছিলেন।

অর্দ্ধেন্দুর যশ যে কেবল বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত, এরূপ নহে। ভারত-বর্ষে যে স্থানে দশজন বাঙ্গালী বসিয়া নাটকের কথা হয়, সেই খানেই অর্দ্ধেন্দুর নাম প্রচার; সকলেই অদ্বিতীয় অভিনেতা বলিয়া জানেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর ভাগ্য সেরূপ প্রসন্ন ছিল না, সে বাঙ্গলার ভাগ্য, কেবল অর্দ্ধেন্দুর ভাগ্য নয়। Variety Theatre অর্থাৎ যে স্থলে নানাবিধ রসের কৌতুক কলাপ হইয়া থাকে, এরূপ থিয়েটারের দর্শক বাঙ্গালায় যথেষ্ট নাই। এরূপ দর্শক থাকিলে, অর্দ্ধেন্দু একক অল্প সাহায্য লইয়া "দেবকার্সনের" ন্যায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। উপস্থিত হাব-

ভাবের পরিবর্ত্তন করিতে অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় সুনিপুণ কলাবিদ্যা বিশারদ পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, অর্দ্ধেন্দু সকল স্থানেই অর্দ্ধেন্দু। নীলদর্পণে "গোলক বসুর" অভিনয় হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও 'অর্দ্ধেন্দুরী' একটু টিপ্‌নি আছে। চাষা হাঁ করিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে একটী মশা মারিল, এটী 'অর্দ্ধেন্দুরী'। "রডা" ও "উড" সাহেব সাজিয়া নৃত্য, ইহাতে অর্দ্ধেন্দু প্রকট। "আবুহোসেনে" সখীদের সহিত পিটবস্ত্র, ঘাগরার ঢংয়ে ছড়াইয়া সখীভাবে নৃত্য, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে গদা খানসামাকে খানসামাগিরি শিক্ষা দেওয়া, ষ্টেজে কাহারও সাজিয়া বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছে,—নাটকের কথাবার্ত্তা বন্ধ রহিয়াছে, হঠাৎ নেপথ্য হইতে একজনকে টানিয়া আনিয়া তাহার সহিত কথা কওয়া; 'লীলাবতীতে' হরবিলাস বসিয়া আছে, (কাহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে, আমার স্মরণ হয় না) অর্দ্ধেন্দু বলিলেন, "জমাদার সাহেব, তোমার আসামী সট্‌কেছে, এখন তুমিই আসামী আর জমাদার দুই হ'য়ে দাঁড়াও, আমাদের কাজ চলুক। (দর্শকগণকে দেখাইয়া) বাবুরা সব ব'সে আছেন।" এ সমস্ত কাহারও বিসদৃশ লাগিত, অপর কেহ করিলে যে বিসদৃশ হইত না, তাহা নহে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর অতুল প্রতিভায় সমস্ত ঢাকিয়া যাইত। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমঞ্চই, ইহা কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। ইহা বুঝাইবার এস্থলে পুনর্ব্বার চেষ্টা পাইব,—

দরোয়ান সাজিয়াছে, তাহারা "ডোঁক ব্যাটা—ডোঁক" বলিয়া হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথাটা এই, শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিতে চাহিয়াছে, কোতোয়ালেরা বলিতেছে "ডাক বেটা চণ্ডীকে ডাক"। শ্রোতারা হাসিতেছে, শ্রীমন্তের হাতে লাল রুমাল জড়ান, পীড়নের কোন চিহ্নই নাই। শ্রীমন্ত গান ধরিল—"মা, কোথায় আছগো শঙ্করী। প'ড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়, বন্ধন জ্বালায় জ্বলিয়া মরি।" ইহাতে শ্রোতারা অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। লাল রুমাল হাতে জড়ানোতে বন্ধন-জ্বালা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না, তথাপি শত শত ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত, সঙ্গীতে শ্রীমন্তের মশান উদ্দীপন করিয়াছে ; বলিতেছে "আহা 'লোকা' কি গায় !" কিন্তু শ্রীমন্তের ভাবে বিমোহিত ! অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ও সেইরূপ। "মুকুলমুঞ্জরায়" বরুণ চাঁদের অভিনয় বিশেষ মনে আছে,তাহারই দৃষ্টান্ত দিই ;—বনের ভিতর বরুণচাঁদ বসিয়াছিল, মন্ত্রী আসিয়া চিনিয়াছে, বরুণচাঁদ আত্মগোপনের চেষ্টায় "আমি কেলোর মা'র কেলো" প্রভৃতি যাহা মুখে আসিল—তাহা বলিল। সকলেই দেখিতে লাগিল যে অর্দ্ধেন্দু, কিন্তু আফিংখোর বরুণচাঁদ সকলেরই মনে অঙ্কিত হইল। অভিনয়কালে অর্দ্ধেন্দু যেন সকলকে বলিতেন—আমি অর্দ্ধেন্দু ;—যে অংশ দেখিতে চাও তাহা এইরূপ, যেন দর্শকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্য হইতেছে। কিন্তু দর্শক যাহা দেখিতে চান, তাহাও ঠিক দেখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুকেও দেখিতেন।

অর্দ্ধেন্দুর স্বদেশ-অনুরাগও বিশেষ পুষ্ট ছিল। "ভারতমাতা" প্রভৃতি ন্যাসান্যাল থিয়েটারে যাহা অভিনীত হইয়াছিল, সে সমস্ত অর্দ্ধেন্দুর প্ররোচনায়। যে সকল পঞ্চরং অভিনয় হইত, তাহাতে বিশেষ রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল এবং তীব্র ব্যঙ্গ-শক্তিতে ঐ সকল পঞ্চরং রচিত না হইলেও অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে সেই শ্লেষের পূর্ণ বিকাশ হইত। অর্দ্ধেন্দুর ধারণা ছিল যে, রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেক কুরীতির প্রতি দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক করা যায়, অনেক কদাচারী দমিত হয়; নীতিশিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা, রঙ্গমঞ্চ হইতে দেওয়া যায়, রঙ্গমঞ্চের কার্য্য—দেশের কার্য্য—তাঁহার জ্ঞান ছিল। অর্দ্ধেন্দু বহু সদ্‌গুণবিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাহা বিকাশ হইবার এক প্রবল বাধা ছিল। যে কেহ আসিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্দ্ধেন্দুর আত্মীয় হইবার ইচ্ছা করিত, তৎক্ষণাৎ সে আত্মীয় হইতে পারিত এবং সেই শঠ যেদিকে লওয়াইবার চেষ্টা করিত, অর্দ্ধেন্দুকে সেইদিকে লইয়া যাইতে কৃতকার্য্য হইত। বলা হইয়াছে অর্দ্ধেন্দুর অভিনেতৃগণের প্রতি বিশেষ মমতা ছিল, যাহারা অকর্ম্মণ্য, কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নিকট ভর্ৎসিত হইয়া অর্দ্ধেন্দুর আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নিন্দা রচনা করিয়া অর্দ্ধেন্দুকে শুনাইত। কর্ত্তৃপক্ষীয় হইতে অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে এ কথা উঠিয়াছে, ও কথা উঠিয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষ অর্দ্ধেন্দুকে অযোগ্য জ্ঞান করে, নানাবিধ নিন্দা করে, "সাহেব, আর এখানে তোমার থাকা উচিত নয়"—এইরূপে অর্দ্ধেন্দুর মনোভঙ্গ করিত। অর্দ্ধেন্দুও তাহার বিশেষ তত্ত্ব না করিয়া, সেই সকল মিথ্যাকথা

প্রত্যয় করিতেন। মিথ্যা কথা বলিবারও তাহাদের কৌশল ছিল। হয়তো কার্য্যস্থলে বলা হইয়াছে, সাহেব অমন বলেন, উঁহার মতে সকল কার্য্য করা চলে না। সে অবজ্ঞা নয়, কথার উত্তরে কথা, তাহা অবজ্ঞারূপে ব্যাখ্যা করিয়া অর্দ্ধেন্দুর ক্রোধ উৎপাদন করিত এবং অর্দ্ধেন্দুকে লইয়া নূতন দল বসাইবার প্রয়াস পাইত। এরূপ অনেকবার হইয়া গিয়াছে। প্রতিবারই শেষে অর্দ্ধেন্দু বুঝিতেন, কিন্তু বুঝিয়াও কোন ফল হয় নাই, আবার তাহাই হইত। অর্দ্ধেন্দুর সহিত আমার রঙ্গমঞ্চে মিলন হওয়া অবধি ক্রমান্বয়ে সুহৃদ্‌ভেদকারী বহু ব্যক্তি জুটিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু তাহাদিগকে চিনিয়াও চিনিতেন না। ইহাতে বহুবিধ কষ্ট পাইয়াছেন; তাঁহার গুণবিকাশে বিস্তর বাধা হইয়াছে; কিন্তু ইহা দৈব বিড়ম্বনা। যখন শেষ অসুখের সূত্রপাত হয়, উক্তরূপ সুহৃৎ জুটিয়া মিনার্ভা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করে। কোহিনুরে গিয়া পীড়ার যতদূর সাহায্য করিতে হয় করিয়াছে। মৃত্যুর দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এ সুহৃৎ নিকটে ছিল। নাট্য জগতের উজ্জ্বল তারা খসিল, ঐ সকল কপটাচারীর মুখে এখন তাঁহার নিন্দা—উনি কথা শুনিতেন না, এ অত্যাচার করিয়াছেন, ও অত্যাচার করিয়াছেন।—আমি তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলি,—"বাপু, তোমাদের মঙ্গল হউক, রঙ্গালয় যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হইল, তাহা তোমরা স্বপ্নেও কখন বুঝিতে পারিবে না। 'জলধর' ও 'যোগেশ' অর্দ্ধেন্দুর শেষ অভিনয়। রঙ্গমঞ্চে বহুদিন আর "নবীন তপস্বিনীর" অভিনয় সম্ভব রহিল না।

অর্দ্ধেন্দু চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বে অনেক অভিনেতা যাঁহারা তারার ন্যায় ইন্দুকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন, তাঁহারা অগ্রে গিয়াছেন। যদি এরূপ হয় যে সমব্যথী আত্মা একত্রে বাস করে, তাহা হইলে তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রেও যেরূপ ছিলেন, তথায়ও সেইরূপ একত্রে আনন্দ করিতেছেন। কিন্তু হেথায় "অর্দ্ধেন্দু নাই—অর্দ্ধেন্দু নাই" এই শব্দ। যিনি কখনও রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুতে তিনিও ব্যথিত। যাঁহারা তাঁহার সহযোগী, তাঁহাদের মনে দিবারাত্র উদয় হইতেছে—"অর্দ্ধেন্দু কোথায় গেল!" ভাবিতেছে আর তাঁর দেখা পাইবে না, আর তাঁর সহিত পরামর্শ হইবে না, আর তাঁহাকে সাজঘরে যত্নের সহিত সজ্জা করিতে দেখিবে না, আর তাঁহার অলৌকিক অভিনয় শুনিবে না; সকলই ফুরাইয়াছে। অর্দ্ধেন্দুর স্মরণার্থে মূর্ত্তি প্রস্তুত হোক, তাঁহার কোন প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান হোক, যাহা হইবার হউক, স্মৃতিচিহ্ন দেশে দেশে থাকুক, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু আর নাই, সে আর ইহ জগতের বার্ত্তা কিছুই রাখিবে না, যোগ্যস্থান লাভ করিয়াছে, অন্য কোন উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত আছে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কি তাঁহার প্রিয় রঙ্গালয় ভুলিবেন? কখনও না! দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যদ্যপি তিনি ভোলেন, যতদিন বাঙ্গলায় রঙ্গালয় থাকিবে, কেহ তাঁহাকে ভুলিবে না। বঙ্গরঙ্গভূমি চিরদিন তাঁহার উজ্জ্বল স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিবে। রঙ্গালয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর অমর!

পরিশিষ্ট।

মিউনিসিপ্যাল আইনটী ভাল কি মন্দ, তাহা যাঁহারা আইন রচনায় বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝুন। কিন্তু যে দিন এই আইন থিয়েটারে প্রবর্ত্তিত হয়, সে দিন স্বাধীনচেতা নট, যেন এই Anglisised আইনের বন্ধন অসহ্য জ্ঞানে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। যেন গ্রন্থকারের, অভিনেতার ও দর্শকের দারুণ অসুবিধা অনুভব করিয়া এই আইনবন্ধনে কার্য্য করিতে অসম্মত হইয়া কার্য্যস্থলে অবসর লইলেন। এ স্থলে পাঠক মনে না করেন, যে আমরা সমস্তরাত্রি অভিনয়ের পক্ষপাতী। আমাদের বক্তব্য এই, যাঁহারা এই আইন প্রস্তাব করিয়াছেন, যাঁহারা এ আইনে সম্মতি দিয়াছেন, বলিয়াছেন ১টা পর্য্যন্ত হইলেই যথেষ্ট। তাঁহারা যদি বাঙ্গালী হন, হয় সে সময় সাহেবি ফ্যাসান ঘাড়ে চাপায় ভুলিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহারা বাঙ্গালী, কিম্বা বাঙ্গালা নাটকের অবস্থা ও বাঙ্গালী দর্শকের অবস্থা একেবারে জানেন না। বাঙ্গালা নাটকে পৌরাণিক বিষয় ব্যতীত যদি কোন নূতন বিষয় হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য কতকগুলি দৃশ্য রচনার প্রয়োজন, কেবল ঘাত প্রতিঘাতের দৃশ্য রাখিলেই চলে না। সাধারণ দর্শক এত দূর উন্নত হয় নাই, যে বুঝাইবার দৃশ্য না থাকিলে তাহা বুঝিতে পারে। সমালোচকের সমালোচনা— প্রতি নাটক অভিনয়ের পরে বৃহৎ স্তম্ভপূর্ণ "বাঙ্গালায় আর এমন

নাটক হয় নাই" এই পর্য্যন্ত, কি দোষ কি গুণ তাহা তাহাতে নাই। সেই সমালোচনা পাঠে পাঠকও কিছু শেখে না, কি লক্ষ্য করিবে তাহা দর্শকও বুঝিতে পারে না ;—গ্রন্থকার হয়তো একটু স্ফীত হন এই মাত্র ফল। একেই আপনার লেখায় পক্ষপাত বশতঃ দোষ লক্ষ্য করা কঠিন, তাহার উপর সমালোচক যে কোন বিদেশী উচ্চ নাটকের কথা শুনিয়াছেন বা পড়িয়াছেন, তাহার চরিত্রের সহিত আলোচ্য নাটকের চরিত্র সমান উজ্জ্বল বলিয়া দেখিতে পান। আবার একশ্রেণীর সমালোচক কখন' কখন' দেখা দেন, তাঁহারা নাক সিঁট্‌কাইয়া আছেন, "বাঙ্গালায় নাটক নাই, অভিনয় নাই, সকলই দোষ।" বহু শতাব্দী স্থাপিত বিদেশী রঙ্গালয়ের সহিত অর্দ্ধশতাব্দী-অসম্পূর্ণ বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের তুলনা পূর্ব্বক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া চলিয়া যান। পণ্ডিতপ্রবর বুঝেন না, যে বাঙ্গালী দর্শকের জন্য বাঙ্গলা নাটক লিখিতে হইয়াছে। সেক্‌সপিয়রের নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু বুঝেন না যে, যদি সেক্‌সপিয়ার স্বয়ং বাঙ্গলায় আসিয়া নাটক লেখেন, তাহা বাঙ্গালী দর্শকের বোধগম্য হইবে না। সমালোচক না হয় বুঝিয়া যাইবেন, কিন্তু অপর দর্শক তাহা পয়সা দিয়া দেখিতে আসিবে না। আমার এ কথাটী আনুমানিক নয়। যখন মিনার্ভায় "ম্যাক্‌বেথ" অভিনয় হয়, দুই চারি অভিনয় রজনীর পর রঙ্গালয় প্রায় দর্শকশূন্য হইয়াছিল। প্রথম প্রথম যে সকল দর্শক আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন আমাদের সাক্ষাতে বলেন, "আমি প্রায় দশ বৎসর থিয়েটার দেখিতেছি, কিন্তু এমন ঠকন

কখনও ঠকি নাই।" তাহার পর 'আবুহোসেন' হওয়ায় অনেকে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। 'মুকুলমুঞ্জরায়' হুইবার মুকুল ও তারার পরিচয় আছে, তথাপিও কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—"কই, ভাল বোঝা গেল না।" এই তো দর্শকের অবস্থা। তাহার পর অনেক দর্শকেরই শনি ও বুধবারে ৯টার পূর্ব্বে আসিবার অসুবিধা; কার্য্যস্থলে অবসর পাইয়া, আহারাদি করিয়া আসিতে গেলে ৯টার পূর্ব্বে আসা চলে না। ৯টায় অভিনয় আরম্ভ করিলে চারি ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। সেই চারি ঘণ্টার মধ্যে কনসার্টের বিরাম দিয়া পাঁচ অঙ্কের নাটক, বর্ণিত দর্শকের নিকট সাফল্যের সহিত প্রদর্শিত হওয়া যে দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহা ইংরাজি-মেজাজ-আইনে সম্মতিদাতার মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই। ষ্টার থিয়েটার, বঙ্কিম বাবুর "চন্দ্রশেখর" নাট্যাকারে প্রবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করে। বঙ্কিম বাবুর "চন্দ্রশেখর" অনেকে পাঠ করিয়া, অভিনয় দর্শন করিতে আসেন। ইহাতে বুঝাইবার দৃশ্যগুলির প্রয়োজন হয় না, তথাপি ১টার মধ্যে আনিবার জন্য নাটকের আকার ছেদ করিতে ম্যানেজার বাধ্য হইয়াছেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনীতে এ সকল উল্লেখ করিতেছি, পাঠক বিরক্ত হইবেন না। এই নটরাজের জীবনীতেই এই সকল কথা উপযোগী। তিনি জীবিত থাকিলে এই সকল কথা তাঁহারই মুখে শুনিতেন।

নাটককার ও দর্শকের অসুবিধার বিষয় বলিলাম। এই

অসুবিধায় অভিনেতাও নিস্তার পায় নাই। আমি অভিনয়ের সময় সংক্ষেপের পক্ষপাতী, কিন্তু ১টা অবধি সময় নির্ণীত হইবে, ইহা শুনিয়া প্রতিবাদ করিতে যাই। ২টা অবধি সময় স্থির হওয়া উচিত, আমি মিউনিসিপ্যাল সভায় বলি। একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমার মত সংস্থাপনের চেষ্টা পাই ; দৃষ্টান্ত এই—আমি তৎপূর্ব্বে ইংরাজি থিয়েটারে "Sign of the cross" দেখিতে যাই। তাহাতে আছে নীরোর অজ্ঞামত রঙ্গস্থল নির্ম্মাণ করিয়া দর্শকসমীপে বন্যপশু দ্বারা একে একে ক্রিশ্চানদিগকে বধ করা হইবে। উপস্থিত নাটকে নীরোর এই আদেশমাত্র দর্শকবৃন্দ শুনিয়াছে। এই আদেশ যে কার্য্যে পরিণত হইতেছে, তাহা তুর্য্যধ্বনিতে ইংরাজ দর্শক বুঝিল। কিন্তু আমার সহিত দুই এক-জন অভিনেতা ছিল, তাহারা সে তুর্য্যধ্বনি কি, বুঝিতে পারিল না। শেষ দৃশ্যে নায়িকা মার্সিয়ার ধর্ম্মোপদেশে, নায়ক মার্কাস, যে ক্রিশ্চানবিরোধী ছিল, বুঝিল ক্রিশ্চানধর্ম্ম সত্য। নায়িকা সিংহ দ্বারা বধ হইবে, নীরোর আদেশ। সিংহ-পিঞ্জর নেপথ্যে—সেই পিঞ্জর মধ্যে নায়িকা প্রবেশ করিবে,—স্ব ইচ্ছায় নায়িকা প্রবেশ করে কি না, তাহা দেখিতে নীরোর দূত উপস্থিত। এমন সময় মার্সিয়ার উপদেশে, মার্কাস পরিবর্ত্তিত হইয়া, মার্সিয়ার হস্তধারণ পূর্ব্বক পিঞ্জরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেবল নীরোর দূতকে বলিল—"Tell Cæsar I am a Christian" অর্থাৎ সিজারকে বলিও আমি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। এই কথার পর করতালিতে যবনিকা পতিত

হইল। আমি এই বিষয়টী বর্ণনা করিয়া গোমাংস-পুষ্ট-মস্তিষ্ক মিউনিসিপ্যাল সভাপতিকে বলিলাম যে "Tell Cæsar, I am a Christian" কেবল এই ছত্রটী বাঙ্গালা থিয়েটারে যতদূর উৎকৃষ্ট অভিনেতা দ্বারা উচ্চারিত হইত, তাহাতে ইংরাজি-থিয়েটারে যে ফল দেখিয়াছিলাম, তাহা হইত না। সহৃদয় পাঠক, আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি যে আমিও একজন অভিনেতা বলিয়া কলিকাতায় পরিচিত। কিন্তু উপস্থিত দর্শক-বৃন্দের সম্মুখে, কেবলমাত্র ঐ একটী পংক্তি অভিনয় করিয়া ফললাভ করিতে পারি না; এবং যদি কেহ পারেন—তিনি আমার পরিচিত নন। যথাযোগ্য হাবভাবের সহিত যে উক্ত পংক্তিটী অভিনয় করা যায় না, ইহা বলিতেছি না। কিন্তু সকল দর্শকের তাহাতে তৃপ্তিসাধন করা উপস্থিত অবস্থায় অসাধ্য। ইহার একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিতেছি; আমার "রাবণ বধ" দর্শকের প্রিয় হইয়াছিল। এই 'রাবণ বধে' যখন রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে বলেন,—তখন সীতাদেবী লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, "কেনরে লক্ষ্মণ তুমি না সম্ভাষ মোরে?" লক্ষ্মণ উত্তর দিল:—"জ্যেষ্ঠ অনুগামী মাতঃ!" স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল, লক্ষ্মণের অংশ লইয়াছিলেন। হৃদিভেদী স্বরে পংক্তিটী উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু দর্শক তাহা ধরিতে পারিল না। পররাত্রে মহেন্দ্রলালের অনুরোধে, কয়েক ছত্র স্বগত উক্তি যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। "কেন মাগো সুমিত্রাজননী, দিয়াছিলে গর্ভে স্থান" ইত্যাদি যেমন লক্ষ্মণের মুখে নিঃসৃত হইল, অমনি করতালিতে রঙ্গালয় কাঁপিয়া

উঠিল। আমি উপরোক্তভাবে সভাপতিকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, কিন্তু বৃথা,—আমার মত সমর্থনের জন্য আমি একা,—সভাপতি আইন করিবেনই, উত্তর করিলেন—"আপনার মতে দেখিতেছি, audienceকে বুঝাইবার জন্য সমস্ত রাত্রি থিয়েটার করিলে ভাল হয়।" আমি বলিলাম, "না, আর এক ঘণ্টা সময় চাই।" উত্তর করিলেন—"৮টার সময় থিয়েটার করো।" আর তাঁর কথার উপর কথা কি! পাঠক বিরক্ত হইবেন না, এ সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা;—যদি কেহ মনে করেন, ৪ ঘণ্টা অভিনয়-উপযোগী দর্শকের মনোহারী নাটক, অযোগ্য নাট্যকার করিতে না পারেন, প্রকৃত নাট্যকার পারেন, কিন্তু সে প্রকৃত নাট্যকার তো প্রায় চল্লিশ বৎসর রঙ্গালয়ে বেড়াইয়া দেখিতে পাইলাম না।

শ্রীশ্রীহরয়ে নমঃ।

শ্রীযুক্ত বসন্ত লাল মিত্র মেজদাদা মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

শ্রীযুক্ত বসন্ত লাল মিত্র দাদা মহাশয়, বেজড়া নিবাসী আমার পিতা প্রাণকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ৺প্রাণকৃষ্ণ মিত্র এক জন প্রসিদ্ধ গায়ক, এবং উপস্থিত কবি ছিলেন। "চাহার দরবেস" (চারি উদাসীন) এবং "গোলেবকাওলী" এই দুই খানি পুস্তক অদ্যাবধিও তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতেছে। দাদা মহাশয় সেই প্রসিদ্ধ কবির সন্তান হইলেও, ঐ কবিত্ব শক্তি তাঁহাতে সঙ্গীত বিদ্যা ও চিত্র বিদ্যা রূপে প্রকাশ পাইতেছে। শৈশবাবস্থা হইতে তিনি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি ৺ নন্দলাল বসু মহাশয় দ্বারা লালিত পালিত হইয়াছেন, সুতরাং বিদ্যোৎসাহ, ও হিতৈষণা ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমরা পাঁচ সহোদর ছিলাম। জ্যেষ্ঠ বিহারি লাল মিত্র পিতার তুল্য গায়ক ও কবি হইয়াছিলেন, কিন্তু ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়। বসন্ত বাবু দ্বিতীয় পুত্র। অচিন্ত লাল মিত্র ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমে দেহত্যাগ করেন। চতুর্থ (আমি) শিবকৃষ্ণ মিত্র, আমি মার্দ্দঙ্গী (পাকোয়াজ বাদক)। ৺কেশব চন্দ্র মিত্রের নিকট পাকোয়াজ বাদন শিক্ষা করি এবং তজ্জন্য সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। কনিষ্ঠ

৺ নিতাইকৃষ্ণ মিত্র। ইনি অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন এবং সঙ্গীত ও চিত্র বিদ্যায় তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তিনি সাধন করেন নাই। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দাদা মহাশয় বাল্যকালে কলিকাতার "গৌরমোহন আড্ডির" স্কুলে পড়িতেন এবং ১২ বৎসর বয়ঃক্রমে ৺ নন্দলাল বাবুর সহিত চন্দননগরে আগমন করেন, এবং হুগলী কলেজে পড়িতেন। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি প্লীহা জ্বরে আক্রান্ত হন, এবং দুই বৎসর কাল পীড়া ভোগ করিয়া অবশেষে মৃত্যু প্রায় হইয়া পড়েন, তজ্জন্য সকলেই তাঁহার অকাল মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়াছিল। কিন্তু কেদার নাথ দত্ত ডাক্তারের ও নন্দলাল বাবুর অত্যন্ত যত্নে ও সুচিকিৎসায় তিনি ক্রমশঃ রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। অত্যন্ত শারীরিক দৌর্ব্বল্য হেতু বসন্ত বাবু হুগলী কলেজে যাইতে অক্ষম হন এবং ফরাসী স্কুলে ফাদার পাউয়ারের নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। চিত্র বিদ্যাতে তাঁহার স্বাভাবিক আসক্তি থাকায় তিনি ফাদার আলফোঞ্জ সাহেবের নিকটে শিক্ষা আরম্ভ করেন। চিত্র বিদ্যা শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি পরীক্ষার জন্য, আল্‌ফোঞ্জ সাহেব তাঁহাকে একটী ছবি (ফুলের তোড়া) কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বসন্ত বাবু সেই ছবিখানি দেখিয়া এ প্রকার নকল করিয়াছিলেন, যে আল্‌ফোঞ্জ সাহেব তাহা দেখিয়া কোন্‌টি আসল এবং কোন্‌টি নকল, বুঝিতে পারেন নাই, এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটি তুলী পারিতোষিক দিয়াছিলেন। ডাক্তার মর্গ্যা সাহেবের নিকটে তিনি একটি ছবি (সিংহ একটি মৃগ স্বীকার করিয়া তাহার উপরে বীরদর্পে দণ্ডায়মান রহিয়াছে) পাইয়া তাহারও নকল করিয়াছিলেন, মর্গ্যা সাহেব তাহা দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন, এবং ফাদার বার্থাকে তাহা দেখান, বার্থাসাহেব

সেই ছবি গ্রহণ করিয়া তৎকালীন বড় সাহেব মুসে কর্ণেল ডু'ব্র্যাকে দেখান, অবশেষে নিজ বিদ্যালয়ের প্রতিপত্তির জন্য, সেই ছবিখানি ফ্রান্সে পাঠাইয়া দেন। এই চিত্র শক্তি তাঁহার স্বাভাবিক হইলেও তৎকালে উহার পূর্ণ বিকাশ হয় নাই।

বিলুপ্ত প্রায় আর্য্য সঙ্গীত বিদ্যার পুনরুদ্ধার সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত। নন্দলাল বাবুর মৃত্যুর পরে, তিনি চন্দননগরে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং শ্রীযুক্ত রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং স্বয়ংও শিক্ষা করিতেন। বিদ্যালয়টির ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, হুগলী প্রভৃতি স্থান হইতে শিক্ষার্থীগণ আসিতে লাগিল। বিদ্যালয়টী ৩৪ বৎসর ছিল, পরে উক্ত শিক্ষক মহাশয় দুই একজন ছাত্রের অনুরোধে ঐ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটীশ চন্দননগরে একটি বিদ্যালয় খুলিলেন; সুতরাং অধিকাংশ ছাত্র সেই শিক্ষকের পশ্চাৎ নূতন স্কুলে গমন করিলেন। বসন্ত বাবু শিক্ষক মহাশয়ের চরণে ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। অবশেষে বিদ্যালয় উঠিয়া যায় দেখিয়া, স্যার ডক্টর রাজা সৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুরকে বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে হরিমোহন বাবুকে আনয়ন করিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করেন, এবং ক্রমে বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে যত্ন করেন। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বসন্ত বাবু মাসিক ॥০ আনা ছাত্রদিগের দেয় বেতন ধার্য্য করিলেন, তাহাতে ব্রিটীশ চন্দন নগরের নূতন স্কুল হইতে অনেক ছাত্র ভাঙ্গিয়া আসিয়া যোগ দিল। নূতন স্কুল ও ॥০ আনা বেতন ধার্য্য করিল, তৎপরে বসন্ত বাবু ফ্রি স্কুল করিলেন, অর্থাৎ স্কুলের সমুদয় ব্যয়ভার নিজে বহন করিয়া,

আসিয়া যোগ দিল, এবং ব্রিটীশ চন্দননগরের নব বিদ্যালয়ের অকাল মৃত্যু ঘটিল।

চন্দনগরে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইলে, বসন্ত বাবু সারদা প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ সঙ্গীত-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকল অনুসন্ধানে ব্রতী হন, এবং মাদ্রাজ হইতে "সঙ্গীত পারীজাত" গ্রন্থ খানি প্রাপ্ত হন, এবং দুই বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া ঐ পুঁথি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে আর কেহ কখন সঙ্গীতের গ্রন্থ (মূল গ্রন্থ) প্রকাশ করেন নাই। সেই গ্রন্থ খানি ভাল রূপ বাঁধাইয়া কাশ্মীরের মহারাজাকে পাঠান হয় এবং অন্য সঙ্গীত গ্রন্থের প্রার্থনা করা হয়। সেই মহারাজা "রত্নাকর" কেবল স্বরাধ্যায় লিখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়া পাঠাইয়া দেন। পরে বসন্ত বাবু সারদা বাবুর সহিত একত্রে পরিশ্রম করিয়া তাহার ব্যাখ্যা সমেত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য যে ঐ দুই খানি গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার বসন্ত বাবুই বহন করিয়াছিলেন। ব্রিটীশ চন্দন-নগরের নব বিদ্যালয় ভাঙ্গিয়া গেলে পর, বসন্ত বাবু নিজের বিদ্যালয় উঠাইয়া দিয়াছিলেন যে হেতু পশ্চিম প্রদেশে যাইয়া সঙ্গীত শিক্ষার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, আর শ্রীযুক্ত রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবহারে তাঁহার অত্যন্ত মনোকষ্ট হইয়াছিল।

ঐ দুই খানি সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম হইয়াছিল, তজ্জন্য বসন্ত বাবুর বায়ুরোগ হয়, অর্থাৎ বুক ধড় ধড় অনিদ্রা ইত্যাদি। তজ্জন্য ডাক্তারগণ তাঁহাকে সঙ্গীত চর্চ্চা করিতে নিষেধ করেন। বসন্ত বাবু বায়ুরোগাক্রান্ত হইয়া সর্ব্বদাই মৃত্যু আশঙ্কা করিতেন ও অত্যন্ত কৃশ হইয়া ছিলেন। সুতরাং তিনি

বেনি মাধব পালের বাটীতে যাইয়া, তাহার চিত্রাঙ্কন দেখিতেন। এক মাস কালি মনোযোগের সহিত চিত্রাঙ্কন দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, এই বিদ্যা তাঁহার জানা আছে, ইহাতে কিছুই নূতনত্ব নাই। অর্থাৎ তাঁহার মনে হইল যে, তিনি অনায়াসে ঐ রূপ চিত্র আঁকিতে পারেন। তৎপরে তিনি বেনি মাধবকে মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন। বেনি পাল মহাশয় প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, দেখিলে ঐ রূপ সহজ বোধ হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ বড় কঠিন ও দুস্কর। তথাপি বসন্ত বাবু তাঁহার নিকট হইতে এক খানি ছবি ও এক খানি তৎ পরিমিত কেম্বিশ লইলেন, এবং ফর্দ্দ অনুযায়িক বাজার হইতে দেশী রং ক্রয় করিয়া তৈল মিশ্রিত করিয়া সেই ছবি খানির একটি সুন্দর প্রতিকৃতি করিলেন। প্রায় এক মাস পরে উহা প্রস্তুত হইলে, উহা বেনি পাল মহাশয়কে দেখান হয় বেনি পাল মহাশয় উহা দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে ৩।৪ বৎসর শিক্ষা করিলেও এ প্রকার আঁকিতে পারা যায় না। যাহা হউক বসন্ত বাবু এই বিদ্যা কি রূপে প্রাপ্ত হইলেন? ইহাই জিজ্ঞাস্য; তিনি শিক্ষা করেন নাই তবে কি প্রকারে ঐ বিদ্যা লাভ হইল?

শ্রীভগবান গীতা উপনিষদে বলিয়াছেন যথা,—

তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকং।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন!

গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

অস্যার্থঃ—হে কুরুনন্দন! যোগীদিগের কুলে জন্ম গ্রহণ করিলে, সেই পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারাপন্ন জ্ঞান লাভ করিতে পারে, জ্ঞান লাভ করিয়া আবার সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান হয়।" তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি যে কোন বিষয় সম্বন্ধে যত টুকু জ্ঞান লাভ করেন তাহার মৃত্যু

হইলে স্থূলদেহ ধ্বংশ হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ থাকে, এবং লব্ধজ্ঞানের সহিত ঐ জীব সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়া তাহার পুনর্জন্ম হয়, সুতরাং পরজন্মে, পূর্ব্বদৈহিক বুদ্ধিসংযোগ লাভ করিয়া থাকে। তৎপরেই বলিয়াছেন যথা,—

প্রযত্নাদ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

অস্যার্থঃ "দৃঢ় প্রযত্ন সহকারে চিত্ত সংযম করিতে করিতে তাহার মন, ক্রমশঃ পাপশূন্য ও নির্ম্মলীকৃত হয়; প্রতি জন্মে বিবেক সংস্কার গুলি কিছু কিছু করিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে, এই রূপে অনেক জন্মের পর ঐ বিবেক সংস্কার রাশি যখন পূর্ণমাত্রা গ্রহণ করে, তখনই পরম গতি বা মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়"।

এই জগতে, সাহিত্য' জ্যোতিষ, গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প, ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে কোন কোন মহাত্মা যে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন, তাহা কখনই এক জন্মের ফল নহে। ইহাই সর্ব্ব প্রকার বৈষম্যের নিগূঢ় কারণ। যিনি বহুজন্ম ধরিয়া যে বিষয়ের জ্ঞান উপার্জ্জনে যত্ন করিয়া আসিতেছেন, ইহ জন্মে, বাল্যাবস্থা হইতেই তাহার সেই সেই বিষয়ের প্রবৃত্তি, আত্যন্তিক আগ্রহ ও দৃঢ় অধ্যবসায় হইয়া থাকে এবং স্থূলদেহের বৃদ্ধির সহিত ঐ সূক্ষ্ম বৃত্তি গুলি বা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিবেক সংস্কার গুলি ক্রমশঃ বিকশিত বা পুষ্ট হইয়া থাকে।

বসন্ত বাবুর, ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার পূর্ব্ব দৈহিক চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় বিবেক সংস্কার, বিকশিত হইয়াছিল; সেই জন্য, শিক্ষা না করিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে তিনি উহা জ্ঞাত আছেন, এবং কার্য্যতঃ সেই জ্ঞানের সম্যক পরিচয়ও দিয়াছিলেন। যাহাই হউক

ঐ চিত্র বিদ্যার উন্নতি কল্পে তিনি দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি কলিকাতার আর্ট স্কুলে প্রতি শুক্রবারে অপরাহ্ণ তিনটার সময়ে যাইতেন, এবং আর্ট গ্যালারিতে উপদেশ পাইয়া বাটী আসিতেন। কুলি মজুরকে ।/০, ।৵০, রোজ দিয়া তাহাদের চেহারা আঁকিতেন ও বিলাতি কেম্বিশ, রং, তৈল, তুলী, ও নানা প্রকার চিত্র বিদ্যার ইংরাজি পুস্তক ক্রয় করিয়া দুই বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম সহকারে অভ্যাস করিয়া ছিলেন। এই দুই বৎসর কালের মধ্যে তিনি জনৈক বৃদ্ধ ইংরাজ উমি সাহেবের নিকটে ফটোগ্রাফ বিদ্যাও শিক্ষার জন্য অনেক যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

তৎপরে বিনোদ লাল সেন কবিরাজের সুচিকিৎসায় তিনি বায়ু-রোগ হইতে মুক্ত হন এবং পূর্ব্ব স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ফটোগ্রাফ এবং চিত্র বিদ্যার সহিত সঙ্গীত বিদ্যার সাধনে যত্নবান হইলেন। এই সময়ে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য তিনি গোয়ালীয়র যাত্রা করেন, কিন্তু গোয়ালীয়রে তাঁহাকে যাইতে হয় নাই, ভগলপুরেই তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধ হইয়াছিল। গোয়ালীয়রের প্রসীদ্ধ ওস্তাদ ৺দেবীসিং তৎকালে ভগলপুরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বাগ্‌চি জজকোর্টের উকীল বাবুকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে ছিলেন,—বসন্ত বাবু তথায় একাক্রমে ৫।৬ বৎসর অবস্থান পূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; এবং চিত্র বিদ্যায়ও অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। পরে চন্দন নগরে পুনরাগমন করেন।

এই সময়ে বীরভূম জেলার খ্যাতনামা District Judge S. H. E. Taytor সাহেবের Memorial Pontrait তিনি লিখিয়াছিলেন। সেই চেহারা অদ্যাবধিও সিউড়ি কোর্টে বিদ্যামান রহিয়াছে। সমুদয় সম্বাদ পত্রে এই চেহারা অঙ্কনের এপ্রকার প্রশংসা প্রকাশ হইয়াছিল

যে, হাতুয়া রাজের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার ৺ভুবনেশ্বর দত্ত মহাশয় বসন্ত বাবুর গুণগ্রাম শ্রবণ ও তাঁহার কতিপয় তৈলচিত্র দর্শন করিয়া মহারাজার চেহারা অঙ্কনের জন্য তাঁহাকে হাতুয়া লইয়া যান। মহারাজার দুই খানি চেহারা আঁকিয়া বসন্ত বাবু যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন এবং দেড় হাজার টাকা পারিতোষক ও পারিশ্রমিক রূপে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তৎপরে তিনি চন্দননগরে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন।

মেজদাদামহাশয়, ভবানিপুর চক্রবেড় নিবাসী ৺গোবিন্দ্র চন্দ্র দে সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার নয়টি পুত্র সন্তান ও দুইটী মাত্র কন্যা সন্তান হইয়াছিল; তন্মধ্যে ছয়টি পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, এবং উপস্থিত তিনটি পুত্র সন্তান বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ মনিন্দ্রগোপাল মিত্র, মধ্যম শ্রীমান্ প্রিয়গোপাল মিত্র, ও কনিষ্ঠ শ্রীমান্ লালগোপাল মিত্র। খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ সর্ব্বাধিকারী বংশোদ্ভব, চোঁয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ প্রমথ নাথ বসু সর্ব্বাধিকারী বাবাজীর সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভ কুলকর্ম্ম হইয়াছিল। এই বিবাহ কার্য্য মানকুণ্ডের প্রসিদ্ধ খাঁ বংশোদ্ভব ৺বলদেব খাঁ (দাদা মহাশয়ের সঙ্গীতের প্রধান ছাত্র) নানা প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং দাদামহাশয় সাংসারিক কার্য্য কলাপে স্বভাবতঃ উদাসীন হেতু, এই বিবাহের যাবতীয় কার্য্যের ভার আমাকেই বহন করিতে হইয়াছিল, বলা বাহুল্য এই বিবাহ অতিসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

ঐ সময়ে, অর্থাৎ ইং ১৮৮৮ সালে, বিলাতে গ্লাসগো মহানগরীতে শিল্প প্রদর্শিনী মহাসভার অধিবেশন হয়, এবং গবর্ণমেন্ট সার্কুলারে প্রকাশিত

মিউসিয়ম্ বাটীতে পাঠাইতে হইবে, পরে কমিটীর দ্বারা ঐ ছবি মনোনীত হইলে, উহা গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে গ্লাসগো নগরে প্রেরিত হইবে, অন্যথা প্রেরক নিজ ব্যয়ে পাঠাইতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ সার্কুলার প্রাপ্ত হইয়া তিনি ঐ সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। হাতুয়ারাজধানীতে দ্বিতীয় বার যাত্রাকালীন তিনি ঐ সাকুলার প্রাপ্ত হন, এবং হাতুয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া ম্যানেজার শ্রীভূবনেশ্বর দত্ত মহাশয়ের পরামর্শে সেই স্থানেই একটি ছবি অঙ্কিত করেন এবং তাঁহারই সাহায্যে ঐ ছবি খানি কলিকাতা মিউসিয়ম্ বাটীতে প্রেরিত হইয়াছিল। ছবিখানি এই—"একটি পরমা সুন্দরী যুবতী বঙ্গমহিলা নিজ সন্তানকে ঝিনুক্ দ্বারা দুগ্ধ পানকরাইতেছে"—এই ছবি খানি বিলাতে সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্য! তাহাতে রূপার বাটি ও একটি পিতলের ঘটি অঙ্কিত ছিল। যুবতীর দুইটী পদ আল্তাযুক্ত ও ২গাছি করিয়া রূপার মলদ্বারা শোভিত ছিল। যাহাহউক ছবিখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য দাদা মহাশয় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট শিল্প-কৌশল ও শিল্পবিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ ছবি, কমিটীর মনোনীত হইয়া গবর্ণমেণ্টের দ্বারা গ্লাসগোতে প্রেরিত হয়, এবং ছয় মাস পরে সমগ্র বাঙ্গলার মধ্যে কেবল বসন্ত বাবুর নামে একটি (Memorial Deploma) মেমোরিয়েল্ ডিপ্লোমা আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, কলিকাতা আর্ট স্কুল হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণ অনেক প্রকার ছবি অঙ্কিত করিয়া পাঠাইয়াছিল, কিন্তু চন্দন নগর নিবাসী বসন্ত বাবু সেই বহু গৌরব যুক্ত ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর বিশেষত চন্দননগরের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইহার পরে, রঙ্গপুরের ডিমলাধিপতি রাজা জানকীবল্লভ সেন বাহাদুর

একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত কারইয়া লন। তৎকালীন ছোট লাট বাহাদুর Sir Stuart Baily সেই প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া কোন ইউরোপীয় আর্টীষ্টের লিখিত বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশে সেই খানি গাত্রের প্রতিকৃতি অন্দরমহলের, শয়নকক্ষে রক্ষিত হয়, এবং রাজ পরিচ্ছদ যুক্ত দ্বিতীয় প্রতিকৃতি বসন্ত বাবুর দ্বারা অঙ্কিত হয়। এই দুই খানি চেহারাতে বসন্ত বাবু দেড় হাজার টাকা নগদ এবং পারিতোষিক স্বরূপ একটি স্বর্ণ পদক এবং রূপার ঘড়ি ও স্বর্ণ চেইন, প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে ফতেপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত যোতীন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরির চেহারা অঙ্কিত করিয়া এক হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। বসন্ত বাবু ক্রমান্বয়ে ৯বৎসর ধরিয়া বাটীতে যাতায়াত করিয়া সমগ্র রাজপরিবারের এবং স্থানীয় অনেক জমিদারের চেহারা অঙ্কিত করেন শ্রীমতি রাণীমাতার চেহারা অঙ্কিত করিয়া ছয়শত টাকা নগদ এবং নিজের স্ত্রীর জন্য এক খানি উৎকৃষ্ট বারানসী সাটী প্রাপ্ত হন। দাদামহাশয় তাঁহার বিদ্যা, বিনয় ও শিষ্টচারে, রাজ সংসারে অতি সম্মানের এবং আদরের পাত্র হইয়াছিলেন।

রঙ্গপুর হইতে প্রত্যাগমন করিবার কয়েকমাস পরে, শ্রীরামপুরের জগৎপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় মহাত্মা গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পত্নীর চেহারা অঙ্কিত করেন। তৎপরেই পুর্ণীয়ার মহারাজার অনুমতিক্রমে ঢাকার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট C. Falder সাহেবের দণ্ডায়মান (standing in full length) চেহারা অঙ্কিত করিবার জন্য ঢাকা যাত্রা করেন এবং দুই মাসের মধ্যে সেই চেহারা এরূপ যত্নে অঙ্কিত করিয়াছিলেন যে, ঢাকা গেজেট, ঢাকা প্রকাশ, East, প্রভৃতি স্থানীয় সংবাদ পত্রে বসন্ত বাবুর অসাধারণ চিত্রকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশ হইয়াছিল, এমন কি, কোমিল্লারা ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বিট সন বেল সাহেব

তথায় লইয়া যান এবং একখানি নিজের Bust Portrait অঙ্কিত করাইয়া লইয়াছিলেন। C. Falder ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি লইয়া তাঁহার সুদীর্ঘ ছবিখানি ঢাকা সহরের (North Brook Hall) নর্থ ব্রুক্ হলে দিবসত্রয় ধরিয়া প্রদর্শনী খুলিয়া বসন্ত বাবু ঢাকা সহরের ও জেলার সমগ্র ভদ্রলোককে উহা দেখাইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার নাম চারিদিকে প্রচারিত হওয়ায়, তিন বৎসর ধরিয়া তাঁহার চিত্র কার্য্যের বিরাম ছিল না। তিনি ঐ ঢাকা সহরে আর কিছুকাল অবস্থান করিলে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু দুইবৎসর কাল অনেক লোকের চেহারা অঙ্কিত করিয়া, তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাবের উদয় হয়, এবং শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শন জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এমন কি! সভার মধ্যে হা ভগবন! হা বৃন্দাবন! বলিতে বলিতে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতেন। সেই ভাব দর্শনে অনেকে তাঁহার বায়ুরোগের লক্ষণ বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় হস্তের কার্য্য সকল তৎপর শেষ করিতে লাগিলেন. এবং নূতন অর্ডার ও অগ্রিম টাকা সকল প্রত্যাখান করিতে লাগিলেন। বহু অনুনয়েও তাঁহাকে কেহ অগ্রিম টাকা লইতে স্বীকার করাতে পারে নাই। হস্তের কার্য্যগুলি শেষ হইলেই তিনি সপরিবারে ঢাকা হইতে শ্রীবৃন্দাবন ধাম যাত্রা করেন।

শ্রীধামে উপস্থিত হইয়া স্বর্গীয় মহাত্মা, পণ্ডিত প্রবর, অদ্বৈতবংশোদ্ভব শ্রীশ্রীপাদ নীলমণি গোস্বামী প্রভুর চরণে শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ, ভগবদ্ গীতা, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু প্রভৃতি ভক্তি শাস্ত্র সকল তিন চারি বৎসর ধরিয়া ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে করিতে শ্রীপাদের শ্রীমুখাৎ সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও নিগূঢ় রহস্য সকল সম্যক অবগত হইয়া তাঁহার এ প্রকার বৈরাগ্য ও ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছিল যে,

দুই বৎসর পরে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার অবশিষ্ট জীবন সেই পুণ্যতীর্থে অতিবাহিত করিবেন। পরে সেই স্থানে পরিবার রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং জমিদারির কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন ও অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন।

আজীবন শ্রীধামে বাস পরম সৌভাগ্য সাপেক্ষ, সেই ভাগ্য তাঁহার ছিল না। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভ বিবাহ উপলক্ষে এবং আমার বিশেষ অনুরোধে তিনি সপরিবারে কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবাহান্তে পুনরায় শ্রীধামে প্রত্যাবর্ত্তনেরও তাহারউৎকট ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা ঘটিল না। নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান মনীন্দ্র গোপাল বাবাজীবনের বিবাহ দিবার জন্য কলিকাতায় অবস্থান করিতে লাগিলেন; সেই সময়েহাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব চিফ জাষ্টিস ৺রমেশচন্দ্র মিত্রের চেহারা আঁকিবার অর্ডার পাইলেন সুতরাং তিনি কলিকাতা মহানগরীতে ষ্টুডিও খুলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই চেহারা আঁকিয়া দাদা মহাশয় কলিকাতায় যথেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং তৎপরে ৺রাজা দিগম্বর মিত্রের চেহারা অঙ্কিত করেন। তৎপরে চৌরঙ্গী হইতে রঙ্গপুরের স্বর্গীয় মহারাজা গোবিন্দলালের চেহারা আঁকিবার অর্ডার পান এবং তাহা শেষ করিয়া হাইকোর্ট হইতে রিটায়ার্ড জজ্ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেহারা আঁকিবার অর্ডার পান এবং সেই চেহারা প্রস্তুত হইলে উহা হাইকোর্টে রক্ষিত হইল। এই প্রকারে ৬।৭ বৎসর মহানগরীতে অবস্থান করিয়া দাদা মহাশয় চিত্রবিদ্যার সহিত তাঁহার সঙ্গীত বিদ্যারও যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিলুপ্তপ্রায় আর্য্য-সঙ্গীত-বিদ্যার পুনরুদ্ধার সাধনই, তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও দৃঢ়ব্রত এবং কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি ঐ মহৎ কার্য্যোদ্ধারের অনেক সুবিধা পাইয়াছিলেন।

কলিকাতার "ভারত সঙ্গীত সমাজের" তিনি একজন সভ্য ছিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত শিক্ষারও তত্ত্বাবধারণ করিতেন, ইহা ব্যতীত অন্যান্য সঙ্গীত সমাজেরও সভ্য ছিলেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে অনেক ভদ্র সন্তান তাঁহার নিকটে বিনা ব্যয়ে সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করিতেন। তাঁহার জেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান মনীন্দ্র গোপাল বাবাজিউ এবং আরও কয়েকটি ছাত্র এই পবিত্র বিদ্যাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, এবং সভাতে গান করিবারও ক্ষমতা হইয়াছে। কলিকাতার অনেক মাইফেলে বিশেষতঃ স্বর্গীয় মহাত্মাদ্বয় ৺কেশব চন্দ্র মিত্র ও ৺মুরলীধর সেন মহাশয় দিগের আহ্বানে, তিনি উপস্থিত থাকিতেন। কোন কোন সঙ্গীত সভাতে পিতা পুত্রে একত্রেও গান করিয়াছেন।

এই সময়ে অর্থাৎ ইং ১৯০৮ সালে তাঁহার জনৈক জ্ঞাতি পিতৃব্য শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মিত্র মহাশয়, তাঁহার ১৫৯ নং আহিরীটোলা ভবনে "সঙ্গীত মিত্রালয়" নামক এক সঙ্গীত সভা প্রতিষ্ঠাপিত করেন। বিলুপ্ত প্রায় আর্য্য সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার সাধন, সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীত ব্যবসায়ী-দিগকে সর্ব্বপ্রকার উৎসাহ দান, এববং সর্ব্বসাধারণের সঙ্গীত শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করাই এই সভার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য যে দাদা মহাশয় এই সভার প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মহাশয় ধনবান ব্যক্তি, এবং আহিরীটোলার প্রসিদ্ধ ৺রামধন মিত্রের প্রপৌত্র এবং ৺যদুনাথ মিত্রের একমাত্র সন্তান। তাঁহার অন্তকরণ পবিত্র ও চরিত্র উদার, নির্ম্মল পরোপকারই তাঁহার ব্রত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি নিঃসন্তান। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বাবু এই "সঙ্গীত মিত্রালয়" স্থাপন করিয়া অবধি, ইহার উন্নতিকল্পে

বিজ্ঞান সম্বন্ধে এবং সঙ্গীত শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ঐ সভাতে অনেক সারগর্ভ বর্ক্তৃতা দিয়াছেন এবং ঐ সকল বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা তাৎপর্য্য বহু সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গত বৎসর কাশীমবাজারের মহারাজা, শ্রীযুক্ত ভুতনাথ মিত্র এবং দাদা মহাশয়কে সাদরে ও বহু যত্ন করিয়া তাহার রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং বসন্ত বাবু রাজবাটীতে সহস্রাধিক ভদ্রলোকের সম্মুখে, আর্য্য সঙ্গীত সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন, তাহাতে মহারাজা উৎসাহিত এবং পরম সন্তুষ্ট হইয়া, সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতিকল্পে অর্থব্যয় করিবেন এবং যথেষ্ট সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন।

সঙ্গীত মিত্রালয়ের যদিও উপস্থিত শৈশবাবস্থা, কিন্তু শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মিত্র মহাশয়ের আন্তরিক যত্নে ঐ সভা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতেছে। সভ্যগণের অনুরোধে, অসংখ্য উপাধি ভূষিত জগৎপ্রসিদ্ধ, সার, রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর এই সঙ্গীত মিত্রালয়ের সভাপতি (President) হইয়াছেন এবং তাঁহার ও শ্রীযুক্ত ভুতনাথ বাবুর অনুরোধে বসন্ত বাবু Vice President পদে কার্য্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন, এবং রাজ কুমার শ্রীযুক্ত শিব কুমার ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত ভুতনাথ মিত্র সম্পাদকদ্বয় (Secretaries) হইয়াছেন। এই সভার যত্নে অতি শীঘ্রই কলিকাতায় একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। গোয়ালীয়র হইতে প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ গায়ক শ্রীযুক্ত নারায়ণ দামোদর মহাশয়কে শিক্ষকের জন্য আনয়ন করা হইয়াছে।

/বসন্ত বাবু বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া "গান্ধর্ব্ব সংহিতা" নামে একটি সঙ্গীত পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার প্রথমভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগে গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিলে, ঐ পুস্তক খানী সমগ্র কালেজের পাঠ্য পুস্তক হইবে, ইহাই তাঁহার ও মিত্রালয়ের

একান্ত ইচ্ছা। বসন্ত বাবু, অনেক অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি "নর্ত্তকনির্ণয়" নামক এক খানি আর্য্যসঙ্গীত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। উহা দেব নাগরি অক্ষরে হস্তলিখিত পুঁথী! ঐ গ্রন্থ খানির ব্যাখ্যাও বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিবার জন্ম তিনি গত তিন মাস কাল মতিহারি সহরে আমার নিকটে বাস করিতেছিলেন, ত্রিহুতবাসী পণ্ডিত গণের সাহায্য গ্রহণেই তাঁহার উদ্দেশ্য। সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতি কল্পে বসন্ত বাবু যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহাতে তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র, এবং আমরা অন্তরের সহিত তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি। দাদামহাশয় গত তিন বৎসর কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চন্দননগর বাগবাজারস্থ ভবনে অবস্থান করিতেছেন, এবং স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক সন্তানকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেছেন। চিত্রবিদ্যা ও ফটোগ্রাফী বিদ্যা-শিক্ষা দিবারও তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, কিন্তু চন্দননগরের দুর্ভাগ্যবশতঃ উপযুক্ত শিক্ষার্থীর অভাব। একজন মাত্র ফটোগ্রাফী শিক্ষা করিতেছে, এবং কয়েকটী ছাত্র সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছে। তাঁহার অপর দুইটী পুত্র শ্রীমান প্রিয়গোপাল ও শ্রীমান লালগোপালও সঙ্গীতশিক্ষা করিতেছেন।

দাদা মহাশয়ের উপস্থিত বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর। তিনি ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তৎব্যতীত চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা ও ফটোগ্রাফী বিদ্যার উপপত্তিক এবং ক্রিয়াসিদ্ধ (theoritical & practical) উভয় বিষয়েই বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। একজন ব্যক্তির এই প্রকার দুরূহ বিদ্যা সকল আয়ত্ত থাকা, যে বিশেষ স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বসন্ত বাবু আমাদের দেশের গৌরবস্বরূপ এবং আদর্শস্থল।

মতিহারি, ১২ই মাঘ, সন ১৩১৬।

বিনীতঃ

শ্রীশিব[illegible]

নবাব হরেকৃষ্ণ।

(শ্রীহট্টের ইতিহাসে একটী অধ্যায়।)

শ্রীহট্ট সুবিদ রায়ের গৃধা-নিবাসী

শ্রীসারদাচরণ ধর প্রণীত।

কলিকাতা

১৯।২ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ পত্রিকা প্রেসে

শ্রীতড়িৎকান্তি বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য দুই আনা।

উৎসর্গ পত্র।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥"

যিনি

আমার শৈশব মানস-ক্ষেত্রে

ইতিহাসের বীজ বপন করিয়াছিলেন,

সেই

সঙ্গীত-নিপুণ, সরল-স্বভাব, ধর্ম্মভীরু

বৈষ্ণব,

মীরমুন্সি বিশ্বনাথের

বালপ্রপৌত্র

ও

মদীয় জনক,

গোলোকগত

৺কৃষ্ণচরণ রায় মুন্সি

মহোদয়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

এই

গ্রন্থ উৎসর্গ করা হইল।

ইতি পিতৃ-চরণাভ্যাং নমঃ।

মুখ বন্ধ।

বঙ্গের সুসময় আসিয়াছে। বাঙ্গালী এখন নাটক নবেলকে উপেক্ষা করিয়া ইতিহাস লিখিতে ও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। যে দেশের ইতিহাস নাই, সে দেশের লোক জীবন্মৃত; চক্ষুষ্মান্ হইয়াও অন্ধ। অধুনা বঙ্গদেশের প্রাচীন প্রধান প্রধান জেলা গুলির ইতিহাস বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রাচীন ও এককালীন প্রধান স্থান আমাদের শ্রীহট্টেও এই সুবাতাস বহিয়াছে। শ্রীহট্টের কৃতবিদ্য সন্তানগণ জন্মভূমির পুরাবৃত্ত সংগ্রহে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা শ্রীহট্টের কোন সুযোগ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের হস্তে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইতে চলিয়াছে। বসন্ত সমাগমে পূর্ব্বদূত পিককুলের ন্যায় আজ কতিপয় বৎসর যাবৎ "শ্রীহট্ট-দর্পণ," "শ্রীহট্টের ইতিহাস," "শ্রীহট্টের সাহজলাল," "শ্রীহট্টনূর" প্রভৃতি শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ঘটিত বহু পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে; এ ক্ষুদ্র লেখকের এ ক্ষুদ্র উদ্যমও তাহাদের অন্যতম।

শ্রীহট্টের ইতিহাসের উপাদান প্রধানতঃ যে কয়েকটী প্রাচীন ঐতিহাসিক কেন্দ্রে নিহিত আছে তাহা এইঃ—কসবা শ্রীহট্ট, লাউড়, রাজনগর, তরপ, বানিয়াচঙ্গ, আতুয়াজান (জগন্নাথপুর ও কেশবপুর), প্রতাপগড়, জয়ন্তীপুর ইত্যাদি। শ্রীহট্ট সহরের উপকণ্ঠে স্থিত গ্রন্থকারের স্বগ্রামটী এক সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের একতম অংশ "সরকার শ্রীহট্টের" রাজধানী ছিল। মহল্লা সুবিদ রায়ের গৃধা একটী প্রাচীন

জনপদ, ইহার প্রাচীনত্ব দিল্লির সম্রাট সের সাহের আমল পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা যায়। একদিন ইহা সৌধসরোবরে মণ্ডিত, নানা জাতীয় লোকের অধ্যুষিত, ঘন বসতিপূর্ণ উপনগর ছিল, আর আজ সচরাচর সর্ব্বত্র সুপ্রাচীন স্থানের যে দশা, ইহারও তাই—ম্যালেরিয়াতে জনশূন্য—উৎসন্ন প্রায়, লুপ্তগৌরব অজ্ঞাত পল্লী।

যে পুরুষসিংহকে আশ্রয় করিয়া সুবিদ রায়ের গৃধা একদিন সগৌরবে মস্তক উন্নত করিয়াছিল, তাঁহারই উজ্জ্বলা কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণন এ ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য। হরেকৃষ্ণ সুধু শ্রীহট্টের গৌরব নহেন, সমস্ত বঙ্গভূমিরও বটে। যদি তিনি অকালে গুপ্ত হত্যায় নিহত না হইতেন, তবে হয়ত আজ তাঁহাকে আমরা যশোহরের সুবিখ্যাত প্রতাপাদিত্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী আসনে সমাসীন দেখিতে পাইতাম। হয়ত তাহার ফলে আজ বঙ্গের ঐতিহাসিক চিত্রপটে মাতৃভূমি শ্রীহট্টকে অধিকতর সমুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত দেখিতাম। কিন্তু হায় নিয়তি!

হরেকৃষ্ণের বৃত্তান্ত প্রচুররূপে জানা যায় নাই; জানিবার আর উপায়ও নাই। বঙ্গের এই সুদূর সীমান্তবর্ত্তী স্থানে জন্মিয়া এ কুসুমটী সম্পূর্ণরূপে ফুটিতে না ফুটীতেই—ফুটিয়া সৌরভ সম্যক্ বিকীরণ করিবার আগেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। বাল্যকালে গ্রন্থকার তদীয় পিতৃদেবের মুখে যেটুকু শুনিয়াছিল, মাত্র তাহাই এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইল। যদি এতৎ পাঠে তাহার স্বদেশবাসীর কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতি জন্মে ও ইতিহাস পাঠের কৌতূহল বৃদ্ধি হয়, তবে সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিবে ইতি।

শিলং।
১১ই ফাল্গুন, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

গ্রন্থকারস্য।

নবাব হরেকৃষ্ণ।

(শ্রীহট্টের ইতিহাসে একটী অধ্যায়।)

"*　*　*　শোণিত,
শ্রীহট্টে সরমা-তটে হইল পতিত ;
সেনাপতি রাধানাথ
করিয়া অরাতি-পাত
অগণ্য-যবন-সৈন্য-বেগ নিবারিল,
যবন-বিজয়-লক্ষ্মী টলিতে লাগিল ;
"অবশেষে অবিশ্বাস-নিহত-জীবন
প্রভুর রক্তাক্ত শির শূলাগ্রে নিরখি—
'নিহত প্রভু আমার !
কার তরে যুদ্ধ আর ?
যথা কৃষ্ণ তথা রাধা' বলিয়া অমনি
বক্ষে নিমজ্জিয়া অসি পড়িল ধরণী !"

আর্য্য-দর্শন—১২৮৮ বং, আশ্বিন ও কার্ত্তিক সং।

কাল মাহাত্ম্যে এই স্থূল ভৌতিক জগতে নিত্য নিত্য ঘোর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে ; কাল যেখানে সুরম্য সৌধরাজি বিরা-

ষ্ঠিত সমৃদ্ধিশালী মহানগর ছিল, আজ সেখানে ভয়াবহ শ্বাপদকুল পরিপূর্ণ মহারণ্য হইয়াছে; আবার আজ যেখানে এই অরণ্য দেখিতেছ, কাল হয়ত দেখিবে তাহা বহু জনাকীর্ণ সুন্দর নগরীতে পরিণত হইয়াছে। ইতিহাসের প্রতি পত্র এই কথার—কালের এই বিচিত্র ক্রীড়াবশে পার্থিব পদার্থ নিচয়ের নশ্বরতা জ্ঞাপক মহাতত্ত্বের—অকাট্য প্রমাণ বহন করিতেছে। এককালে যে গৌড়নগর বঙ্গ-রাজ্যের বিপুল সৌভাগ্য চিহ্নশালী মহানগরী রাজধানী ছিল, আজ তাহা সিংহ ব্যাঘ্র নিসেবিত মহারণ্য হইয়া গিয়াছে; আর দুই শত বৎসর কাল মধ্যে নগণ্য অপরিচিত সুতানটী, গোবিন্দপুর ও কালকাটার জঙ্গলাকীর্ণ আর্দ্রভূমি আজ ভুবন বিখ্যাত মহানগরী কলিকাতাতে পরিণত হইয়াছে। মানুষের পক্ষেও সেই কথা; কত কত বড় বড় মহাকুলীন বংশও হীনতা দরিদ্রতার নিষ্পেষণে ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া নগণ্যতার অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে, আজ কে তাহাদের খোঁজ লয়, আর অপর দিকে কত ক্ষুদ্র অপরিচিত সামান্য লোক ভাবী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতেছে, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কত ক্রীতদাস, দোকানী, মুদী, নগণ্য কৃষক চাষার বংশধরগণ আজ রাজা মহারাজ হইয়া সদর্পে বিচরণ করিতেছেন; আর প্রবল প্রতাপ বিপুল ভারত সাম্রাজ্যাধিপতি দিল্লীর বাদশাহের বংশধর আজ রেঙ্গুনে গাড়ীর কোচমানগিরি করিয়া দিনপাত করিতেছেন; কয়জন তাহার তত্ত্ব রাখে? একটু খোঁজ রাখ দেখিবে কত লোক তোমার চক্ষুর উপরে দেখিতে দেখিতে বড় ও মান্যগণ্য পক্ষান্তরে ছোট ও হেয় হইয়া যাইতেছে। আজ তুমি সমাজে হীন ও ক্ষুদ্র আছ, কমলার কৃপাচ্ছায়াতে তোমার ধন হইলে তোমার বংশে কালে আচার বিনয়-বিদ্যা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমার কুলকে দেশের শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিবে।

কালচক্রের অবিরাম আবর্ত্তনে কত বড়লোক, ছোটলোক হইয়া গিয়াছেন ও কত ছোটলোক এখন বড়লোক হইয়া উঠিতেছে। জাগতিক ঘটনাপরম্পরার উপর যে একটু নজর রাখে সেই এই কথার সত্যতা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করিতেছে।

শ্রীহট্ট অতি প্রাচীন দেশ, ইহা এককালে পূর্ব্ববঙ্গের একটী প্রধান স্থান ছিল। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যে সময় আধুনিক নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ স্থান, বঙ্গোপসাগরের বসতিহীন কি বিরল-বসতি ক্ষুদ্র দ্বীপ-পুঞ্জ হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া ভারত মহাদেশের সহিত যোজিত হইয়া তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছিল, তাহার পূর্ব্বেও শ্রীহট্টে দেবতা-ব্রাহ্মণ-সেবক আর্য্য-নরপতির রাজ্য ছিল। সুপ্রসিদ্ধ চৈন পর্য্যটক হুয়েন্‌সঙ্গের জগদ্বিখ্যাত ভ্রমণ বৃত্তান্তে শ্রীহট্টের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (১)। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও এই শ্রীহট্টে অনেক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় জ্বলন্ত প্রতিভালোকে জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল, সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন ও মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন, সাধারণ পাঠকবর্গের তাহা অবিদিত নহে। শ্রীহট্ট পুণ্যভূমিও বটে, যেখানে পীঠমালোক্ত দুইটী মহাপীঠের অধিষ্ঠান এবং যাহা সিদ্ধ-সাধক মহাপুরুষ মহাত্মা ঠাকুর বানী, বৈষ্ণব রায়, ঠাকুর যুগল, শান্ত দাস, রামকৃষ্ণ গোঁসাই ও দরবেশ-প্রবর সাহাজলাল, সারপীন প্রভৃতির তপোক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত।

মোগল সাম্রাজ্যে শ্রীহট্ট একটী প্রধান সীমান্তবর্ত্তী সামরিক নগর

(১) Beal's "Life of Hœn Tsang"—pp. 138; Beal's "Buddhist Records of the Western countries" vol. III—p. 195—foot note; also Cunningham's "Ancient Geography of India"

ছিল (১)। আকবর বাদসাহের আমল হইতে সুবা বাঙ্গালা ১৯টী সরকারে বিভক্ত ছিল, শ্রীহট্ট তাহাদের একতম (২)। শ্রীহট্টের মোগল শাসনকর্ত্তাগণ "ফৌজদার আমিল"—স্থানীয় পদবীতে "নবাব" বলিয়া অভিহিত হইতেন। সম্ভ্রান্তবংশীয়—অধিকংশ স্থলে বঙ্গের সুবাদার বা মুরশিদাবাদের নবাবের সম্পর্কিত রণকুশল অভিজ্ঞ রাজপুরুগণ শ্রীহট্টের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইতেন (৩)। শ্রীহট্টের শিল্পবাণিজ্য জাত দ্রব্যাদি তৎকালে সমগ্র মোগলসাম্রাজ্যে আদরের সামগ্রী ছিল, ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচক নানা গ্রন্থে ইহার উদ্দেশ পাইবেন। শ্রীহট্টের চুণা, মোম, গজদন্ত, অগুরুকাঠ ও তৎনিঃসৃত সুরভি আতর, সুগন্ধি মসল্লা, মুগা ও তৎপ্রস্তুত বস্ত্রাদি, বাদাম ইত্যাদি এক সময়ে ভারত বিখ্যাত ছিল। শ্রীহট্টের লামা-বাজারবাসী কারুকর-নির্ম্মিত সুদৃশ্য

(১) "In the days of Mugal rule it (Sylhet town) enjoyed the prestige which naturally attaches to the residence of a native official of some importance. It was the largest town on the frontier and was thus the centre of some trade"—The Gazetteer of Sylhet p. 200.

(২) আইন-ই-আকবরী দ্রষ্টব্য।

(৩) Hunter's "Statistical Account of Sylhet"—p. 260, and "Lives of Lindsays" vol. III, p. 163.

সম্রাট সাহজাহানের অধিকারকালে শ্রীহট্টের ফৌজদার ও তুয়ুলদার মহম্মদ জামান খাঁ কামরূপরাজ্য বিজয়ের জন্য বাদসাহ কর্ত্তৃক যুদ্ধাবসানে বঙ্গের সুবাদার ইস্‌লাম খাঁর অব্যবহিত পরবর্ত্তী উচ্চসম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। (Journal of the Asiatic Society দেখ।)

উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ঢাল এককালে সমগ্র মোগলসাম্রাজ্যের বীরমণ্ডলীতে সমধিক আদরণীয় ছিল। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর উৎপাত নিবারণার্থে ঢাকাতে যে নৌযুদ্ধ বিভাগের আড্ডা ছিল শ্রীহট্টই তাহার জন্য রণতরী যোগাইত (৪)। ইংরেজাধিকার আরম্ভ হওয়ার কালেও শ্রীহট্টে বড় বড় নৌকা নির্ম্মিত হইত, শাসনকর্ত্তা মিঃ লিণ্ডসে এইরূপ একখানি সুনির্ম্মিত বৃহৎ নৌকায় শ্রীহট্ট হইতে যাত্রা করিয়া বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া মান্দ্রাজে গিয়াছিলেন, ইহা তৎকৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। মোগল সরকারের জন্য হাতি খেদাও শ্রীহট্টে হইত; বাদসাহ, নবাব, আমীর, ওমরাহ প্রভৃতির জন্য শ্রীহট্টের অরণ্য হইতে হস্তী ধৃত হইয়া সাম্রাজ্যের নানাস্থানে সরবরাহ হইত। এই সরকারী হাতী খেদার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে শ্রীহট্টে "খেদা মহাল" নামে একটী মহাল লাখেরাজ জায়গীর রূপে পৃথক বন্দোবস্ত করা থাকিত। মোগল সরকারের পুর্ত্তবিভাগের কাযের জন্য চুনাও শ্রীহট্ট হইতে প্রস্তুত হইয়া প্রেরিত হইত; ঐ কার্য্য সম্পাদনের জন্য জনৈক দারোগা বা নায়েব নিযুক্ত থাকিতেন। বঙ্গাধিপতি নবাব মিরজাফর ও নবাব মিরকাসেমের সহিত ইংরেজরাজের যে সন্ধি হইয়াছিল, তদুভয় সন্ধিপত্রের দফা সকলের মধ্যে শ্রীহট্টের চুনামহাল একতমের বিষয়ীভূত হইয়াছিল (১)। লিণ্ডসে সাহেব এই চুনার কারবার করিয়া ও তৎপরে ছাতকের সুবিখ্যাত ইঙ্গলিশ (Inglis) পরিবার অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন। ইঙ্গলিশ কোম্পানীর ধনশালীত্ব এদেশে বহু প্রবাদের জন্মদাতা। শ্রীহট্ট

(৪) W. Hamilton's "East India Gazetteer," vol. II, p. 552-554.

(১) Aitchison's "Treaties, Engagements and Sanads" vol. I, pp. 48 and 49.

সহরটী অন্যূন সহস্র বৎসরের পুরাতন এ কথা নির্ব্বিঘ্নে বলা যাইতে পারে। অধুনা নানা কারণে ইহার চরম দুর্দ্দশা হইয়াছে। ইহা এক কালে একটী স্বাস্থ্যপূর্ণ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। ইংরেজ কালেক্টার আমুটী (Mr. Ahmuty) সাহেবের সময়েও (১৮০১) কশবা শ্রীহট্টের জনসংখ্যা ১,৮৮,২৪৫ জন পুরুষ, ১৬৪,৩৮১ জন স্ত্রী ও ১,৪০,৩১৯টী শিশু, মোট ৪,৯২,৯৪৫ প্রাণী ছিল; তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত যথাক্রমে ৩ ও ২ এইরূপ ছিল, (২)। এ জনসংখ্যা প্রকৃতরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিলে তাহার তুলনায় শ্রীহট্ট যে আজ একটী শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এ কথা কে অস্বীকার করিবে? (১) মোট কথা মোগল অধিকারে বঙ্গদেশে শ্রীহট্টের

---

(২) W. Hamilton's "East India Gazatteer" vol II, p. 553.

এ জন সংখ্যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে উইলীস সাহেবের নির্দ্ধারিত সংখ্যার সহিত মিলাইলে প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। ৬।৭ বৎসরে এত প্রভেদ হওয়া সম্ভবপর নহে।—লেখক।

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তদানীন্তন কালেক্টার জন উইলিস্ সাহেব শ্রীহট্টের জনসংখ্যা ৭৫৩৮২ স্থির করিয়াছিলেন। আদম স্নমারী মতে:—

১৮৭২ খৃঃ—১৬৮৪৬

১৮৮১ খৃঃ—১৪৪০৭

১৮৯১ খৃঃ—১৪০২৭

১৯০১ খৃঃ—১৩৮৯৩—বাদ অস্থায়ী কুলীসংখ্যা অনুমাণিক ৫০০, স্থির জনসংখ্যা আনুমাণিক ১৩৪০০ দাঁড়াইয়াছে।—Gazetteer of Sylhet, p. 197-19°.

স্থান ঢাকার ঠিক পরেই ছিল, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে কোন বিষয়েই ঢাকা ব্যতীত আর কোন স্থান শ্রীহট্টের সমকক্ষ ছিল না; কিন্তু হায় সেই শ্রীহট্ট কাল মাহাত্ম্যে আজ আসামের অসভ্য খাসিয়া ও নাগা পাহাড় প্রভৃতির সহিত সংযোজিত (২)!

যাউক সে সব কথা, আমার বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রীহট্টের অদ্বিতীয় অসাধারণ প্রতিভাশালী কায়স্থকুলপ্রদীপ মহাত্মা সমসের-উল্-মুল্‌ক হরেকৃষ্ণ দাসের বৃত্তান্ত। যিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের প্রপৌত্র বাদশাহ মহম্মদশাহকে গুণগ্রামে মোহিত করিয়া সেই মুসলমান প্রাধান্যের কালে দিল্লীশ্বরের দরবার হইতে শ্রীহট্টের নবাবীর সনদ লইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন, যিনি করাল নিয়তির বিধানে দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র আড়াই বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়া অকালে বিশ্বাসঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, তথাপি এই স্বল্পকাল মধ্যে যিনি সমস্ত শ্রীহট্টদেশে গোব্রাহ্মণ ও আর্য্যধর্ম্মের কল্যাণার্থে বহুল সদনুষ্ঠান, ভূমিদান ইত্যাদি করিয়াছিলেন এবং তাৎকালিক মুসলমানাধিকারেও অন্যথা (অকালে অপমৃত্যু না ঘটিলে) যথাসম্ভব হিন্দুস্বাতন্ত্র্যসংস্থাপন যাঁহার প্রাণের কামনা ছিল, কিন্তু কাপুরুষ দুরাত্মা শুকুরুল্লার ষড়যন্ত্রে অকালে অরক্ষিতাবস্থায় প্রাণ

"There are numerous roads, many of which are metalled and supplied with masonry bridges, but crumbling houses and deserted homesteads are evidence of a glory that has passed away".—p. 199. Ibid.

(২) ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্ট সুবাবাঙ্গলার অন্যান্য অংশের সহিত বৃটিশাধিকারে আইসে এবং ১৮৭৪ অব্দে বঙ্গপ্রদেশের ঢাকা বিভাগ হইতে খারিজ হইয়া নবগঠিত আসামপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দেওয়াতে তাহা পূর্ণ হইতে পারে নাই, তাঁহার কাহিনী প্রত্যেক শ্রীহট্টবাসীর অবশ্য-জ্ঞাতব্য।

প্রসঙ্গতঃ হরেকৃষ্ণের পূর্ব্বতন সময়ের শ্রীহট্টের ইতিহাস সংক্ষেপে কথিত হওয়া আবশ্যক। দরবেশ সাহাজলালের মৃত্যুর পর শ্রীহট্টপ্রদেশ তদানীন্তন গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়া এক এক জন কানুনগো কর্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। এই কানুনগোর প্রধান কর্ম্ম ছিল,—রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া গৌড়ের সদর দরবারে প্রেরণ করা, কতকটা বর্ত্তমান কালেক্টারের কার্য্যের ন্যায়। কানুনগো গহর খাঁ আসোঁয়ারির মৃত্যু হওয়াতে শ্রীহট্টে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা উপস্থিত হইলে, সুলতান হুসেনসাহ শ্রীহট্ট সহরের প্রসিদ্ধ মজুমদারবংশের আদিপুরুষ সর্ব্বানন্দ গুপ্ত ওরফে সর্‌ওয়ার খাঁকে (যিনি তাঁহার দরবারে একজন প্রধান সভাসদ স্বরূপ থাকিয়া কোন ঘটনাধীনে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জাতিত্যাগ করেন, যাঁহার স্বতন্ত্র বিবরণ আছে) শান্তিসংস্থাপন করিতে জনৈক সেনানীসহ প্রেরণ করেন (১৪৬৪ খৃঃ অব্দে); সর্‌ওয়ার খাঁ তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া শ্রীহট্টের কানুনগো নিযুক্ত হন। তদবধি শতাব্দি পরিমিত কাল শ্রীহট্টের স্থানীয় রাজশক্তি তৎবংশধরগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল (১)। সম্রাট্ অকবর সাহের রাজত্বকালে সর্‌ওয়ার খাঁর প্রপৌত্র জেহান খাঁর নাবালক অবস্থায় (তখন কতিপয় ব্যক্তি প্রতিনিধি স্বরূপে তাঁহার নামে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তরপের প্রথিতনামা সুবিদরায় দস্তিদার যাঁহাদের অন্যতম ছিলেন) শ্রীহট্টে পুনর্ব্বার অশান্তি ও উপদ্রব আরম্ভ হইল, সম্রাট্ পূর্ব্ব নিয়ম রহিত করিয়া আমিল নিয়োগ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন (১৫৭০ খৃঃ অব্দ)। সম্রাটের রাজস্বমন্ত্রী

---

(১) The Mazumdar family of Sylhet" নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

সুবিখ্যাত রাজা তোডরমল্লকর্ত্তৃক বঙ্গের অন্যান্য স্থানের সহিত শ্রীহট্টেরও স্থির জমা বন্দোবস্ত হয় (২), এবং তদবধি খাস দিল্লির দরবার হইতে এক এক জন সুদক্ষ ফৌজদার আমিল নিযুক্ত হইয়া শ্রীহট্টপ্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। আমিলগণের কর্ত্তব্য শুধু রাজস্ব-সংগ্রহ ও দাখিল করা নহে, তৎসঙ্গে দেশের আভ্যন্তরীন শাসনকার্য্যও পরিচালনা করিতে হইত। এহেতু তাঁহাদের অধীনে রাজকীয় ব্যয়ে এক এক বাহিনী ফৌজও রক্ষিত হইত (১)। রাজা তোডরমল্ল শ্রীহট্টপ্রদেশ জরিপ করিয়া ইহাকে একটী "সরকার" গঠিত করেন ও ইহার মোট রাজস্ব ১৬৭,০৪০৲ তঙ্কা নির্দ্ধারিত করেন। সম্ভবতঃ নজিব আলী খাঁই শ্রীহট্টের প্রথম ও বহারম্ খাঁ শেষ আমিল। আমিলগণ প্রায়শঃ পরিবর্ত্তিত ও স্থানান্তরিত হইতেন, কেননা সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে রাজকার্য্য-সৌকর্য্যের অনুরোধে তাঁহাদিগের কার্য্যনিয়োগের দরকার হইত। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে গিরিয়ার প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীহট্টের ফৌজদার সমসের খাঁ (দক্ষিণ শ্রীহট্টের সমসের নগর পরগণা, সমসেরগঞ্জের হাট প্রভৃতি নামে যাঁহার শাসন চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে) বঙ্গাধিপতি নবাব সর্‌ফরাজ খাঁর পক্ষে সমুপস্থিত ছিলেন (২)। কোন ফৌজদার

---

(২) ১৫৮২ খৃঃ অব্দে তোডরমল শ্রীহট্টের স্থির জমা বন্দোবস্ত করিয়া ১,৬৭,০৪০৲ তঙ্কা রাজস্ব নির্দ্ধারিত করেন। Gazetteer—২১৩ পৃঃ।

(১) এই বাহিনী নিম্নলিখিতরূপে গঠিত ছিল, ১১০০ অশ্বারোহী, ১৯০ গজ ও ৪২৯২০ পদাতিক।—আইন-ই-আকবরী।

(২) মুরসিদাবাদের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (বাবু নিখিলনাথ রায় প্রণীত) দ্রষ্টব্য।

আমিলই গড়ে ৩।৪ কি জোর ৫ বৎসরের অধিককাল শ্রীহট্টে থাকিতে পারিতেন না (৩)।

যাহা হউক তরপ নিবাসী সুবিদ রায় দস্তিদার মধ্যে মধ্যে শ্রীহট্ট নগরে আসিয়া তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। প্রাচীন শ্রীহট্ট নগর তখন রায়নগর, বরশালা, আথালিয়া ইত্যাদি উচ্চতর স্থান লইয়া অবস্থিত ছিল (৪); আধুনিক খাস সহরের স্থান তখন এক বৃহৎ জলাশয়ের অন্তর্গত ছিল; যাহার কতক কতক অংশ খণ্ড খণ্ড ভাবে এখনও বর্ত্তমান আছে। সহরের যে অংশে সুবিদরায়ের আবাস বাটী ছিল, উহা এক্ষণে মহল্লা সুবিদ রায়ের গৃধা নামে পরিচিত। সম্রাট আকবরের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষ হইতে শ্রীহট্টে আমিল নিয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে সুবিদ রায় উচ্চতর রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হন; তখন এই বংশের হাতে কেবল রাজকীয় দস্তকের (শীল মোহরের) জিম্মা ও ভূমি জরিপের ভারমাত্র রহিয়াছিল। আমাদের এপ্রবন্ধের নায়ক হরেকৃষ্ণ এই সুবিদ রায়েরই বংশে অধস্তন তৃতীয় পুরুষরূপে উদ্ভূত হন। হরেকৃষ্ণের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি ও জলন্ত প্রতিভা তাঁহাকে সেই সময় এই অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ করিয়াছিল; তিনি পারসী ও উর্দ্দু ভাষাতে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া রাজনীতিতে অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন দিল্লীর মোগল বাদসাহের ক্ষমতা ও প্রভাব তখন খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল। বঙ্গে মুর্শিদাবাদের নবাবগণ একরূপ স্বাধীন হইয়া উঠিতেছিলেন, তাঁহাদের অধীনে ঢাকার শাসনকর্ত্তা কার্য্য করিতেন। বঙ্গেশ্বরের অধীনে তখন পশ্চিমাংশে পাটনায় ও ও পূর্ব্বাংশে ঢাকাতে একজন ছোট খাট নবাব (Deputy Governor)

(৩) Hunter's Statistical account of Assam—Sylhet."
(৪) "The Lives of the Lindsays,"—vol. III, 167 p.

থাকিতেন। শ্রীহট্টের ফৌজদার আমিলকে এই ঢাকার নবাব দরবারেই রাজস্ব বৎসর বৎসর দাখিল করিতে হইত। শাসন বিষয়ে মুর্শিদাবাদের ও রাজস্ব বিষয়ে ঢাকার নবাবের অধীন হইলেও, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শ্রীহট্টের ফৌজদার-আমিল খাস দিল্লীশ্বরের দরবার হইতেই নিযুক্ত হইতেন, কদাচিৎ বঙ্গেশ্বরের নিয়োগও বহাল হইত। হরেকৃষ্ণ স্বীয় অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও রাজনীতিজ্ঞতাতে দিল্লীশ্বরকে মোহিত করিয়া ১৭২০ খৃঃ অব্দে গৌরবসূচক সমসের-উল-মুল্লুক উপাধিতে ভূষিত হইয়া শ্রীহট্টের ফৌজদার-আমিলী সনদ লইয়া আইসেন। তাঁহার সঙ্গে সেনাপতি রাধানাথ ওরফে মাধব খাঁন ও মীরমুন্সী বিশ্বনাথ তদীয় খাস কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া রাঢ় দেশ হইতে আইসেন (১)। হরেকৃষ্ণ শ্রীহট্টে আসিয়া মালিনী স্রোতস্বতীর সমীপে প্রসিদ্ধ সাগর দিঘী নামক দীর্ঘিকা খনন, তাহার পারে দেবালয় সংস্থাপন, চারি পারে অষ্টোত্তর শত কালীপূজা, জেলার সর্ব্বত্র দেবতা ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশে ভূমিদান (যাহার বহুল প্রমাণ এখনও বর্ত্তমান) ইত্যাদি প্রভৃত সদনুষ্ঠান করেন। পূর্ব্বপুরুষ সুবিদ রায়ের বাসাবাটীর স্থানে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করতঃ স্থায়ীরূপে স্বীয় বাস্ত ভাদ্রাসন নির্দ্ধারিত করেন, তাহার চিহ্নাবলী অদ্যাপি ভূমির উপরে দৃষ্ট ও প্রবাদাকারে শ্রুত হইয়া থাকে।

যাহা হউক হরেকৃষ্ণ নবাবী পদ পাইয়া শুভক্ষণে শ্রীহট্টে পদার্পণ করেন নাই। তখন ঢাকার নবাবের আত্মীয় শুকুরুল্লা খাঁ শ্রীহট্টে শাসন

---

(১) সেনাপতি রাধানাথের বংশ বর্ত্তমান আছে কিনা জানা যায় না। জনশ্রুতি এই, নদীর অপর পারে গুটাটীকর জৈনপুরে তাঁহার আবাসস্থান ছিল। মীর মুন্সী বিশ্বনাথের বংশাবলী বর্ত্তমান আছে, এখন ষষ্ঠপুরুষ চলিতেছে।

কর্ত্তা ছিলেন। এজগতে সৎ ও অসৎ উভয়বিধ কর্ম্মের ফলে লোকে সুখ্যাত ও কুখ্যাত হইয়া থাকে; শ্রীহট্টের আমিলগণের মধ্যে ফৌজদার ফারহাদ খাঁ ও শুকুরুল্লা খাঁ উভয়েই সেইরূপ শ্রীহট্টের আবালবৃদ্ধবণিতার নিকট সুপরিচিত। শ্রীহট্টে রাজপথ, সেতু ও এমারত ইত্যাদি নির্ম্মাণের সম্পর্কে ফারহাদ খাঁর নাম যেরূপ, সেইরূপ হরেকৃষ্ণের নামের সঙ্গে, লর্ড মেওর সহিত দুরাত্মা সিয়ার আলীর ন্যায়, কাপুরুষ শুকুরুল্লার নাম বিজড়িত ও বংশানুক্রমে লোক পরম্পরায় প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। হরেকৃষ্ণ খোদ দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া আইসাতে শুকুরুল্লাকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত হঠাৎ অবসৃত হইয়া স্থানান্তর যাইতে হইল। তিনি তাহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নানা অছিলায় শ্রীহট্টে থাকিয়া গুপ্তভাবে হরেকৃষ্ণের সর্ব্বনাশের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। বিধর্ম্মী হিন্দুকে কার্য্য ভার প্রদানের প্রণালী লইয়া তাঁহার প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। শুকুরুল্লা অনেক গোলমালের পর শাসন ভার প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত যে রাজস্ব তহবিলে মজুদ ছিল, তাহা ছাড়িয়া দিলেন না। মোগলাধিকার কাল হইতে ইংরাজের আমলের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের রাজস্ব ঢাকাতে প্রেরিত হইত। মুর্শিদাবাদের নবাবগণের রাজকোষ যেমন সুপ্রসিদ্ধ জগৎশেঠগণের জিম্মায় থাকিত, তদ্রূপ মহল্লা সুবিদ রায়ের গৃধা নিবাসী সুপ্রাচীন "সাহা" বংশীয়গণ শ্রীহট্টের রাজকোষের অধ্যক্ষ ছিলেন (১)। শুকুরুল্লা হরেকৃষ্ণের বিরুদ্ধে

---

(১) বর্ত্তমানে প্রোক্ত মহল্লাতে প্রাচীন "সাহার দীঘি" ও "সাহার পট্টী" নামদ্বয়ে মহাধনী সাহাগণের নাম সজীব আছে। 'সাহা' জাতি নহে, উহা প্রাচীনকালে নবাব কর্ত্তৃক ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রদেয় ধন-

গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন ও তাহাতে

সমুদ্রের' সাহা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) সাহা হইতে অধিকতর ধনীগণ "শেঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীগণ "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করিতেন। সমগ্র সুবা বাঙ্গালায় জগৎশেঠ কেবল এক পরিবারই ছিলেন বলিয়া জানা যায়। বক্ষ্যমান সাহাগণ কায়স্থ জাতীয় ছিলেন। ইহাঁরা শ্রীহট্টের আমিলগণের খাজাঞ্চি বা কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহাদের ধনের কথা প্রবাদজনক, অদ্যাপি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে ঢাকার কোন নবাব রাজকার্য্য ব্যপদেশে শ্রীহট্টে আগমন করিলে তাৎকালিক কোষাধ্যক্ষ সাহাজি তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্বীয় বাটীতে নিয়াছিলেন, প্রবাদ বলে, রাজপথ হইতে যে পথ দিয়া নবাবের পাল্কী গিয়াছিল তাহা স্বর্ণ মোহরে মণ্ডিত করা হইয়াছিল। উত্তর কালে এই সাহাদের ধনশালিত্বের প্রভূত পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, এতৎসমস্তের সমাবেশ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হইবার স্থল নহে। শেষ বংশধর কুক্রিয়াশক্ত সাহা গোকুলচন্দ্র রায় সম্পত্তির ভগ্নাবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা অপব্যয়িত করিয়া হীনবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহাতেও উদর-পূর্ত্তি হইল না, পরিশেষে বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ ব্রহ্ম-শাপে কুষ্ঠগ্রস্থ হইয়া আনুমানিক ৩৫ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিবাহ করিতে পারেন নাই, গতিকে তাঁহা হইতেই বংশলোপ হইয়াছে। ইহাদের সুবিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল, তাহার অধিকাংশই দশসালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইঁহাদের ছাড়াবাড়ীতে এক খানা সেকেলে দ্বিতল অট্টালিকা অদ্যাপি প্রায় অভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। ১৮৯৭ সালের দারুণ ভূমিকম্পেও ইহার কিছুই করিতে পারে নাই।

শ্রীহট্টের স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের অনেককেই (১) টানিয়া লইতে

সুবিদ রায়ের গৃধার অধিবাসী ছিলেন, তাহারা শিকাদার উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। এক সময়ে ইঁহাদেরও সুবিস্তীর্ণ তালুক মুলুক ছিল। অষ্টা-দশ শতাব্দির শেষ ভাগে ভগ্নদশাতে দস্তিদার বংশের সহিত পুরুষানু-ক্রমিক বিবাদে হীনবল হইয়া বাঞ্ছারাম শিকাদার কৌড়িয়া পরগণাস্থ স্বীয় তালুকান্তর্গত ইউসফপুর মৌজাতে আবাস বাটী উঠাইয়া লইয়া যান। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিপচন্দ্র শিকাদার সম্পত্তির ভগ্না-বশিষ্ট তালুক মুল্লুক লইয়া দীর্ঘকাল মামলা মোকদ্দমা করিয়া যেটুকু বাকী ছিল তাহাও নষ্ট করিয়া ফেলেন। বাঞ্ছারামের তিন কন্যা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিপচাঁদ সম্পত্তির অধিকারী হন ও দুলাল চাঁদ রায় নামক একটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। দুলাল-চাঁদের অপ্রাপ্ত বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে এই বংশ লুপ্ত হইয়াছে। বাঞ্ছারামের একজ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র রামনারায়ণ রায় সুবিদ রায়ের গৃধার বাটীতেই থাকিয়া যান। তিনি সাধু প্রকৃতি ও সংসার বিরাগী ছিলেন। অবিবাহিতাবস্থায় সৎকর্ম্মে সম্পত্তি ব্যয়িত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে মহাযাত্রা করিয়া যান। তথায় আজ আটাশ বৎসর হইল তাঁহার ব্রজধাম প্রাপ্তি হইয়াছে। মহাযাত্রার প্রাক্কালে মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তির সহিত একযোড়া বনিয়াদি জীর্ণ পুরাতন শাল বিক্রয় করেন, ক্রেতা তাহা হইতে প্রায় সের পরিমিত সোণা পাইয়াছিলেন।

(১) যাঁহারা শুকুরুল্লার ষড়যন্ত্রে যোগ দেন নাই অর্থাৎ হরেকৃষ্ণের পক্ষে ছিলেন, পরে বিজয়ী শুকুরুল্লা তাঁহাদিগকে অশেষ প্রকার নির্য্যাতন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্ততিগণ কেহ কেহ পলাইয়া স্থানভ্রষ্ট ও কেহ কেহ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া জীবিকার জন্য হীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া

পারিয়াছিলেন; প্রোক্ত রাজকোষাধ্যক্ষ সাহা তাঁহাদের অন্যতম। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, শুকুরুল্লা তাঁহার সময়ে সংগৃহীত রাজস্ব হরেকৃষ্ণকে বুঝাইয়া দেন নাই, অথচ ষড়যন্ত্র ও স্থানীয় বিশৃঙ্খলা ফলে নূতন রাজস্বও রীতিমত আদায় করা হরেকৃষ্ণের পক্ষে সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইল, তাহাতে ঢাকাতে রাজস্ব প্রদানের কিস্তির সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল, সুযোগ বুঝিয়া শুকুরুল্লা ঢাকার দরবারে মিথ্যা রটাইয়া দিলেন যে, হরেকৃষ্ণ রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া নিজে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে শুকুরুল্লা গোপনে গোপনে ঢাকার নবাবকেও হাত করিয়া লইয়াছিলেন ও সর্ব্বত্র হরেকৃষ্ণের মনোগত মুসলমান বিদ্বেষের ও হিন্দু স্বাতন্ত্র্য স্থাপনের প্রয়াসের কথাও প্রচারিত করিয়া দিলেন। মনে ভাবুন সেই মুসলমান প্রাধান্যের কালে হঠাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জনৈক হিন্দুর পক্ষাবলম্বন কয়টি লোকই বা নিরাপদ মনে করিতে পারে? শুকুরুল্লার প্রদত্ত বিষ বটিকা ঢাকার নবাব হইতে মুর্শিদাবাদের নবাবও গ্রহণ করিলেন। সেকালে দিল্লীর মত সুদূরবর্ত্তী রাজধানী হইতে কথায় কথায় সম্রাটের নির্দেশ সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রধূমিত অগ্নি আর কতক্ষণ প্রচ্ছন্ন থাকে, হিন্দু মুসলমানে বিবাদের আগুণ শ্রীহট্টে আবার জ্বলিয়া উঠিল। শুকুরুল্লা দেখিলেন খোদ দিল্লীশ্বর প্রদত্ত রাজশক্তি সম্পন্ন মহাপ্রতিভাশালী পরাক্রান্ত হরেকৃষ্ণ বাঁচিয়া থাকিতে চরম জয়ের আশা তাঁহার পক্ষে একরূপ দুরাশা; তাই হরেকৃষ্ণের গুপ্ত হত্যার ষড়যন্ত্রও সংগোপনে আঁটিলেন—হরেকৃষ্ণের দেহরক্ষক সৈনিকগণের একব্যক্তি শুকুরুল্লার নিকটে গোপনে স্বধর্ম্ম বিক্রয় করিয়া তাঁহার গুপ্ত হত্যার ভার লইল।

হইয়াছিলেন। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের তীব্র অভিসম্পাতের ফল অদ্যাপি কেহ কেহ ভোগ করিতেছে।

তখন হিন্দু মুসলমানে প্রধূমিত বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিয়া রীতিমত যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে। শুনা যায় ফাজলসারের নিকটবর্ত্তী মালিনীর তীরস্থিত মাঠে ঐ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল; তাহাতে হরেকৃষ্ণের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ রণকুশল সেনাপতি রাধানাথ মুসলমান বাহিনীকে কিরূপ বিদলিত করিতেছিলেন তাহা প্রবন্ধের শিরোভাগে অমর কবিভাষায় প্রকটিত হইয়াছে। এদিকে যুদ্ধের দিন হরেকৃষ্ণ রীতিমত অন্যান্য দিনের ন্যায় স্নানাদি করিয়া ঠাকুর ঘরে ইষ্ট পূজাতে বসিলেন। কথিত হয়, তখন তিনি কপালে তিলক রচনার সময় দর্পণে স্বীয় স্কন্ধের উপর ছিন্নমুণ্ড দেখিলেন; (১) দেখিয়া বুঝিলেন তাঁহার নবাবীর সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও অবসান হইয়া আসিয়াছে, আর দেরি নাই, এই ভাবিয়া রাজনৈতিক জল্পনা কল্পনা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া ইষ্ট চিন্তাতে নিবিষ্ট ভাবে সংলগ্ন হইলেন। দর্পণে দৃষ্ট অলৌকিক ঘটনা সত্যে পরিণত হইল; এরূপ অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্রনিতিজ্ঞ, আত্মরক্ষাতে অপ্রস্তুত, ধ্যাননিমগ্ন হরেকৃষ্ণকে দুরাত্মা দেহরক্ষক তরবারির গুপ্তাঘাতে হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্নমুণ্ড শূলাগ্রে উত্তোলিত করতঃ উন্মত্তোল্লাসে বর্ত্তমান সেখঘাটের কোন অংশে অবস্থিত শুকুরুল্লার বাটীর দিকে ছুটিল; পথি-পার্শ্বেই অনতিদূরে পূর্ব্বকথিত যুদ্ধক্ষেত্র; সেনাপতি রাধানাথ এই ভয়াবহ শোচনীয় দৃশ্য—শূলাগ্রে প্রভুর রক্তাক্ত মুণ্ড—নিরীক্ষণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; প্রভু নিহত—আর কার জন্য যুদ্ধ করিবেন?

---

(১) প্রাচীনগণের মুখে ধারাবাহিকরূপে যেরূপ শ্রুত হইয়া আসিতেছি, আমরা তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। ঐরূপ অলৌকিক ঘটনা হরেকৃষ্ণের জাগ্রত অবস্থায় না হইয়া স্বপ্নে দৃষ্ট হওয়াই সুসঙ্গত বোধ হয়।—লেখক।

অমনি করস্থিত শানিত অসি স্বীয় বক্ষে নিমজ্জিত করিয়া সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্ত শয্যায় শায়িত হইলেন। হিন্দু মুসলমানে যুদ্ধের অবসান হইল,—শুকুরুল্লার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তাঁহার আদেশে হরেকৃষ্ণের ছিন্নমুণ্ড তদীয় বাটীতে এক উচ্চ বংশদণ্ডে ঝুলাইয়া রাখা হইল—উদ্দেশ্য যেন আর কোন হিন্দু বিপক্ষতাচরণের উদ্যম না করে। শুনা যায়, জনৈক উচিত বক্তা পাগলা ফকির ঐ উচ্চস্থিত মুণ্ড দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ চিৎকার করিয়া ছুটিতে লাগিল—"আরে বাঃ জি লালা হরকিষণ! জীতে সব্‌কো সেরা মরকে বি সব্‌কো উপর।" জীগিষু শুকুরুল্লার কাণে ঐ কথা পৌঁছিলে জনসাধারণের উত্তেজনার ভয়ে তদীয় আদেশে ঐ মুণ্ড অবনমিত হইল; পরে শুনা যায়, উহা হস্তিপদে বদ্ধ হইয়া নগর প্রদক্ষিণে ফিরিতে লাগিল। হরেকৃষ্ণ অজাত-পুত্রক অবস্থায় হত হন, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃব্যের গুপ্তহত্যাভূমি—ঐ অপবিত্র বাটী পরে পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ ব্যবহিত উত্তরে নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়া যান। বর্ত্তমানে তাঁহার সন্ততি সুপ্রসিদ্ধ জমিদার দস্তিদার মহাশয়গণ ঐ বাটীতে বাস করিতেছেন। ইঁহারা শ্রীহট্টীয় কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের পরিপোষক।

হরেকৃষ্ণের অবৈধ হত্যার কোন প্রতিকার হইল না, সেই ঘৃণিত নৃশংসতার জন্য কেহই শাস্তি পাইল না। সেকালে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারের বিরুদ্ধে দিল্লীর মত সুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে সম্রাটের নিদেশ সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। হরেকৃষ্ণের হত্যার পর মীরমুন্সী বিশ্বনাথ ঢাকার দরবারে উপস্থিত হইয়া ঐ নিষ্ঠুর ও নীচভাব প্রণোদিত ঘটনার বিজ্ঞাপন করিয়া কোন ফললাভ করিতে পারিলেন না; অধিকন্তু শুকুরুল্লার কোপানলে পড়িয়া নিজে হৃতসর্ব্বস্ব ও নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

দিল্লীশ্বরের নূতন ফারমান্ আইসার অপেক্ষায় একবৎসরকাল স্থানীয় রাজশক্তি নায়েব আমিল (Deputy Governor) সাদেকউল্লা, (১) নায়েব-ফৌজদার (Deputy Commandant) হরদয়াল (২) ও দেওয়ান (সেরেস্তার অধ্যক্ষ) মাণিকচাঁদ (৩) এই তিন রাজপুরুষের হস্তে ন্যস্ত থাকে, তাহার নিদর্শন অদ্যাপি পুরাতন দলিলাদিতে "সাদেক-উল্-হর্-মাণিক" নামাঙ্কিত মোহরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক বৎসর পর দিল্লীশ্বরের ফারমান আসিলে শুকুরুল্লা শ্রীহট্টের নবাবী মসনদে পুনঃ অধিরূঢ় হন।

সেই মুসলমান প্রাধান্যের দিনে এক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কায়স্থসন্তান স্বীয় ক্ষমতাবলে এতদঞ্চলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক পুরুষ হইতে পারিয়াছিলেন; তিনি বহুদিন হইল কোন উচ্চতর লোকে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দিকোজ্জ্বলকারী কীর্ত্তিমালা অদ্যাপি শ্রীহট্টের সর্ব্বত্র তাঁহার অমর নাম বিঘোষিত করিতেছে।

---

(১) ইনি পূর্ব্বোল্লিখিত সরওয়ার খাঁ মজুমদারের বংশীয় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, ঠিক ইহাই কিনা নিশ্চয় জানা যায় না।—লেখক।

(২) ইনি একজন হিন্দুস্থানী যোদ্ধা, শ্রীট্টের ফৌজের অধিনায়ক ছিলেন।

(৩) ইনি রাজা গিরিশচন্দ্র রায়ের পূর্ব্বপুরুষ, পূর্ব্ব নিবাস হুগলী জেলা, তথা হইতে শ্রীহট্টে আসেন।

সাদেকউল্লা, হরদয়াল ও মাণিকচাঁদ এই তিন রাজকর্ম্মচারীই হরেকৃষ্ণের নিয়োগের পূর্ব্ব হইতেই নিযুক্ত ছিলেন।—লেখক।

পরিশিষ্ট।

দস্তিদার বংশের বংশলতা।

কাশ্যপ গোত্রীয় দাসবংশীয়

- কবিবল্লভ রায়
  - সুবিদ রায়
    - সম্পদ রায়
      - যাদব রায়
(স্ত্রী) সর্ব্বজয়া
        - যুগলকৃষ্ণ রায় (উভয়ে অবিবাহিত অবস্থায় মৃত)
        - রাধাকৃষ্ণ রায় (উভয়ে অবিবাহিত অবস্থায় মৃত)
  - শ্যামরায়
(স্ত্রী) তারিণী
    - লক্ষ্মীনারায়ণ রায়
(স্ত্রী) অমরাবতী
      - শ্রীকৃষ্ণ রায়
(স্ত্রী) রত্নাবতী
        - জয়কৃষ্ণ রায়
(স্ত্রী) সত্যবতী
          - জীবনকৃষ্ণ রায়
(স্ত্রী) ১। গৌরমণি
২। উমাবতী
            - দয়াল কৃষ্ণরায়
(স্ত্রী) অপূর্ব্বা
            - গোপালকৃষ্ণ রায়
(স্ত্রী) উমাতারা
              - নবকৃষ্ণ রায়
(স্ত্রী) দুর্গাসুন্দরী
                - শ্রীযুক্ত নন্দিনীকান্ত রায়,
" রজনীকান্ত রায় এমএ
ডেপুটী মাজিঃ,
" যামিনীকান্ত রায়,
" গিরিজাকান্ত রায়,
" ধরণীকান্ত রায়,
ও দুই কন্যা, — বর্ত্তমান।
      - নবাব হরেকৃষ্ণ রায়
রাণী সর্ব্বমঙ্গলা
(নিঃসন্তান)
    - কৃষ্ণকান্ত রায়
(স্ত্রী) যশোদা

পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু।

(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে
পঠিত প্রবন্ধ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্, এ
অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।

কলিকাতা
২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড, সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৩১৭

মূল্য চারি আনা।



৺চন্দ্রনাথ বসু।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু।

অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যু বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি করিয়াছে, তেমন ক্ষতি বোধ হয় বহুদিন হয় নাই। মৃত্যুর নিবিড় ছায়া ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া বঙ্গসাহিত্য-সংসার অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে। "রৈবতক" 'কুরুক্ষেত্র,' ও 'প্রভাসের' নবীন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নবীনচন্দ্র, বঙ্গভাষার অকৃত্রিম ভক্ত শ্রীশচন্দ্র, ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ রমেশচন্দ্র—একে একে অস্তমিত হইয়াছেন। হিন্দুত্বের গৌরব মস্তকে লইয়া, বঙ্গবাসীর জাতীয় চরিত্রের মহা-মহিমময় আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়া, বঙ্গভাষার উপাসক, চন্দ্রনাথও তাঁহাদিগের অনুগামী হইয়াছেন। আমাদের দরিদ্র-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে এই সকল রত্নরাজি আহরণ করিয়াও মৃত্যুর লুব্ধ করপুট নিবৃত্ত হইল না। আরও একটি উজ্জ্বল হীরক বঙ্গজননীর মুকুট হইতে অপহৃত হইয়াছে। এমন করিয়া কালসমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ, বঙ্গসাহিত্যের এক একটি সুন্দর স্তম্ভ ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং বঙ্গবাসীর প্রকৃতই শোক করিবার কারণ আছে—সাহিত্যজীবনের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাতে নির্ম্মম কালমেঘ উঠিয়া আমাদের হৃদয় দারুণ নৈরাশ্যে ও দুঃখে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ যে মহাত্মার পুণ্য নাম লইবার জন্য আমি আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তিনি বঙ্গসাহিত্যের কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার মোহন স্পর্শে আমাদের সাহিত্য ও জীবন কতখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আমি চেষ্টা করিব। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু যে বঙ্গভাষার একজন কৃতী লেখক ছিলেন, এবং

তিনি যে বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে একটি চিরগৌরবমণ্ডিত প্রাচীন আদর্শ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি আমাদের এবং আমাদের উত্তর-পুরুষের কৃতজ্ঞতার ও অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। এখন যেমন বঙ্গীয় যুবক বঙ্গ-ভাষাকে স্নেহের ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছেন, চন্দ্রনাথের যৌবন-কালে ঠিক এমনটি ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি যাঁহাদিগের নামের পশ্চাতে রহস্যময় বীজমন্ত্রের মত থাকিয়া সে সময়ে পাশ্চাত্যবিদ্যাকে আরও রহস্যময়ী করিয়া তুলিত, তাঁহারা প্রায়ই বঙ্গভাষাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন না। ইংরাজীতে দখল হওয়াই তখন কলেজী শিক্ষার আদর্শ ছিল, ইংরেজীতে ভাল প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণের বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারা বঙ্গীয় যুবকের সুখের স্বপ্ন ছিল; যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার আলোকে ইংরেজী সংবাদপত্রের স্তম্ভে ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া বাহাদুরী লইতে পারিতেন, যাঁহারা ইংরেজীতে অনর্গল বক্তৃতা করিয়া ইংরেজী-গুণগ্রাহী শ্রোতার মন মুগ্ধ করিতে পারিতেন, এবং সময়ে সময়ে দুই একজন ইংরেজের নিকট হইতে পিঠচাপড়ানি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য যে ঈর্ষার বিষয় ছিল, সে সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ?, চন্দ্রনাথ বাবু ইঁহাদেরই একজন ছিলেন। Oriental Seminaryতে উপযুক্ত শিক্ষ-কের তত্ত্বাবধানে ইংরেজীতে পারদর্শী ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া, ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখিয়া জনসাধারণের রুচির অনুকূল পবনে যে অভীষ্ট যশের পরপারে উপনীত হইবেন তাহা আর বিচিত্র কি ? কিন্তু প্রতিভার স্বভাব এই যে, সে চিরভ্রমিত পথে ভ্রমণ করিয়া তৃপ্ত হয় না। স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংব্যক্তি প্রতিভার প্রাণ। প্রতিভাশালী চন্দ্রনাথ মাতৃভাষার সেবায়—অনাদৃতা কাঙ্গালিনী বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে মনোযোগ করিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, চিরস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্র, মনীষী অক্ষয়-কুমার ও ভূদেবচন্দ্র, বাণীকণ্ঠহারের মধ্যমণি মধুসূদন, রসের সাগর দীনবন্ধু

প্রভৃতি যে আলোক রশ্মিমালায় বঙ্গভাষার ক্ষুদ্র কুটীর আলোকিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, চন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই সঙ্গে আর একটি আলোকরেখা মিশাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রখর কিরণে সে ক্ষীণরশ্মিটি নিবাইয়া দিতে পারিল না। তিনি অতি যত্নের সহিত, একান্ত শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার মাতৃভাষার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। বঙ্গসাহিত্যের সেই দীনতা ও অসম্পূর্ণতার দিনে যাঁহারা ইহাকে আশ্রয় দান করিয়া আদৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে আমাদের কতখানি কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহা কি বলিয়া শেষ করিতে পারা যায়?

আমোদের জন্য, কৌতুহলের জন্য বা তাঁহার দুর্লভ অবসর-মুহূর্ত্তগুলি কোন প্রকারে কাটাইয়া দিবার জন্য চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্গভাষার সেবা করেন নাই। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্য-সেবা-ব্রত আলোচনা করিলে মনে হয় যে, তিনি ইহাকে একটি কঠোর সাধনার মত,একটি প্রকৃত তপশ্চর্য্যার মত করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। এমন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবা অধিক লোক করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। আমি ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের জন্য যে সাহিত্যসম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু তাঁহার একাগ্রতা ও আন্তরিকতা। তিনি অতীত সাহিত্যভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া, বিদেশীয় কাব্যসাগরে অবগাহন করিয়া যে অমূল্য রত্নরাশি আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাহার স্বদেশবাসীদিগকে শ্রদ্ধার সহিত দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে কিছুই দিতে পারি নাই—বঙ্গসাহিত্যের পক্ষ হইতে বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ তাই তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করিয়া সেই ঋণ কিঞ্চিৎপরিমাণে শোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনচরিত আলোচনা করিতে হইলে, তাঁহার বংশের বিবরণ এবং অন্যান্য বিশেষ ঘটনাবলী ইত্যাদির ধারবাহিক

থাকে। অসাধারণ ব্যক্তির জীবন-ব্যাপার প্রথম হইতেই অনন্যসাধারণ ইহাই আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। সাধারণতঃ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মাতা উন্নতমনা, কর্ত্তব্যপরায়ণা ও সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইয়া থাকেন; প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পিতা অথবা অন্য কোন পূর্ব্বপুরুষ যে প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন ইহাও আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। "এরূপ না হইলে সেরূপ হইত না," ইহাই আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া জীবনচরিত লিখিবার উদ্দেশ্য সফল করিয়া থাকি। এরূপ চেষ্টাও যে স্বভাবিক, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে, তাহার কার্য্যকারণ-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিতে হয়। মহৎ লোকের জীবনী সম্বন্ধেই বা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? কার্য্য-কারণধারা ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ফেলিতেছে, তখন জীবনচরিতের বিষয়েও আমরা এই অবিসংবাদী নিয়মের অধীন। কিন্তু একটি কথা আমার মনে হয় যে, এই রহস্যপূর্ণ বিশ্বের মধ্যে মনুষ্যজীবনই সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময়। আকাশের নক্ষত্ররাজি গণনা করা সহজ হইতে পারে, সমুদ্রের বীচিমালা গণনার আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু বিচিত্র মনুষ্যজীবনের ঘটনাবলীর ইয়ত্তা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। মনুষ্যচরিত্র দেবতারাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, ইহা এতই জটিল ও সমস্যাপূর্ণ।

মনুষ্যজীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি যদি জানিতে পারা যাইত, তাহা হইলে কার্য্যকারণসম্বন্ধ জীবনের কোন্ অংশ কিরূপে গঠিত হইল, তাহা সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের মত গণিয়া বলা যাইত। কিন্তু ঐ "যদি" লইয়াই ত যত গোল-যোগ। আমরা মনুষ্যজীবনের শত কি সহস্রাংশের একাংশ জানি কি না সন্দেহ; সুতরাং এস্থলে কার্য্যকারণপরম্পরা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া অনেক সময়ে বিড়ম্বনামাত্র। এত বিচিত্র রকমের শক্তি, এত বিচিত্র ঘটনা মানুষের জীবনে

সহিত সৌন্দর্য্যের রম্য কানন স্কট্‌ল্যাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—সেই পর্ব্বত-মালাশোভিত, সমুদ্রবিধৌত, সরোবরখচিত, অরণ্যরাজিত, স্বভাবশোভার প্রমোদভবন—স্কট্‌ল্যাণ্ড রাস্কিনের সুকুমারচিত্তে সুষমার বীজ বপন করিয়াছিল, তাই তিনি বড় হইয়া সৌন্দর্য্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। জীবনচরিতলেখক এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, আমরাও বুঝিয়া তৃপ্ত হইলাম। কিন্তু একটি কথার মীমাংসা হইল না :—বাল্যকালে সৌন্দর্য্যের শ্রী যাহাদের নয়নসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহাদের মধ্যে কতজন রাস্কিনের মত হইতে পারে? অরণ্য জঙ্গলে ঘুরিয়া কতজনে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত বনদেবতার আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিয়াছে? এইজন্য আমার বোধ হয়, মানবজীবনের আলোচনায় কার্য্যকারণধারা আমাদিগকে বহুদূর লইয়া যাইতে পারে না। বিশ্বব্যাপিনী এই কার্য্য-কারণধারা আমি উপেক্ষা করিতেছি না। অনেক চিরন্তন সত্যই আমরা কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। মানবজীবন তাহাদেরই মধ্যে একটি। কোন্ অজ্ঞাত প্রদোষে, স্বাতীনক্ষত্রের শিশিরবিন্দু পড়িয়া এই মানবসমাজের শুক্তিমধ্যে প্রতিভারূপ মুক্তা জন্মগ্রহণ করে, তাহা আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি না। আমরা কেবল প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া সম্ভ্রমে ও বিস্ময়ে মূক ও মৌন হইয়া থাকি।

প্রতিভার রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব না হইলেও, প্রতিভাসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবনচরিতের আলোচনায় যে প্রভূত উপকার সাধিত হয়, তাহা সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইতেছে। স্মৃতিসভা করিয়া, জীবনচরিতের ব্যাখ্যা করিয়া, আলেখ্য বা মর্ম্মরে প্রতিকৃতি রক্ষা করিয়া একটি জাতি তাহার উপদেষ্টা বা নেতার চরণে যে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে, তাহা সেই জাতীয় হৃদয়ের স্বাভাবিক স্পন্দনমাত্র। এরূপ না করিলে একটি জাতিকে জাতীয় কর্তব্য হইতে স্খলিত হইতে হয়। চন্দ্রনাথ বাবু নিজে কিন্তু

জীবনবৃত্ত অনাবশ্যক মনে করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন : "ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতিরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যদি জীবনচরিত লেখা হয়, তাহা হইলে জীবনচরিত লিখিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। মৃত্যুর পরেও থাকে, কোনও লোকের জীবনে এমন কিছু থাকিলে সে লোকের জীবনচরিত না লিখিলেও তাহা থাকিবে। মানুষের প্রাচীন গুরুদিগের জীবনচরিত কেহ কখনও লিখে নাই, কিন্তু তাঁহারা সকলেই জীবিত আছেন। মৃত্যুর পর যাহা থাকিবার নয়, জীবনচরিত লিখিলেও তাহা থাকে না।.........কাল যাহা ডুবায় তাহা ডুবিবার জিনিস, মানুষ সহস্র চেষ্টায় তাহা ভাসাইয়া রাখিতে পারে না। তাহা ডুবিয়া যাওয়াই উচিত। কালের ন্যায় সুন্দর চমৎকার বিচক্ষণ জীবনচরিত-লেখক আর নাই।" (জীবনের কথা—ত্রিধারা)। কথাটি একদিক দিয়া দেখিলে ঠিক ; স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে কালই শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি। কিন্তু জীবনচরিত লেখার উদ্দেশ্য কেবল তাহাই নহে। যে সকল মহাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের দেশ, সমাজ বা সমাজের কোন অংশের উপর প্রভাব-বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিত উপদেশের আকরভূত। তাঁহাদের আশা ও নৈরাশ্য, ক্ষমতা ও অক্ষমতা, সফলতা ও বিফলতার মধ্য দিয়া কেমন করিয়া একটি মহৎ উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে মানবসমাজকে উন্নতির আবর্ত্তনশীল পথে লইয়া গিয়াছে, ইহা সব সময়েই কৌতুহলজনক এবং শিক্ষাপ্রদ। সুতরাং জীবনচরিতের মূল্য সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত একমত না হইতে পারিলেও প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে না।

বড় বড় লোকের জীবন হইতে অনেক শিক্ষালাভ করা যায়, বিশেষ যখন সেই সকল লোক লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সমাজ অথবা সমগ্র মানব জাতির মঙ্গলের জন্য যখন ইহাঁরা গম্ভীর উদাত্ত স্বরে সত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন মানবমণ্ডলী মুগ্ধ বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহাদের দিকে

সসম্ভ্রমে চাহিয়া রহিয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবুর গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে এই ধারণাই মনে আইসে, যেন তিনি একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের আহ্বানে, বাঙ্গালী হিন্দুসমাজকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার জন্যই তিনি লেখনী গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্যই তাঁহার গ্রন্থে নিষ্ফল রচনা একরূপ বিরল। তিনি দেখিলেন যে পাশ্চাত্যশিক্ষার বন্যায় দেশের যাহা কিছু ভাল, বাঙ্গালীর যাহা নিজস্ব, তাহা ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে; সামঞ্জস্য (Homogeneity) বিহীন সমাজ আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ, বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া প্রাচীরের মত স্থির ও অটলভাবে সেই প্লাবনের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে প্লাবন যে কি ভয়ানক তাহা সেই সময়কার ইতিহাস পাঠ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না।

ইংরেজ বণিককোম্পানী যখন ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহাদের সংসর্গে আসিয়া, তাঁহাদের ন্যায়পরতায় ও অন্যান্য কতকগুলি সদ্‌গুণে এদেশীয় লোক এই নূতন জাতির আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিল। তাহার পর ইংরেজ যখন কলিকাতায় মাদ্রাসা, ফোর্টউইলিয়ম কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দুকলেজ খুলিয়া দেশীয় যুবকদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, তখন বঙ্গদেশ টলমল করিয়া উঠিল। ইংরেজীশিক্ষার বিস্তার করিয়া ইংরেজরাজ যে বিপ্লবের সূচনা করিলেন, তাহাতে সমাজদেহ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বহুদিন বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক অনুর্ব্বর ও নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল; সংস্কৃতজ্ঞ কতিপয় পণ্ডিত আবহমানকাল প্রচলিত কাব্যের শ্লোক আওড়াইয়া, অথবা ন্যায়ের ফাঁকির চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন। অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতায় জীবন অতিবাহিত করিত। বহুদিন বাঙ্গালী নূতন তত্ত্বের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত ছিল। এখন যেমনি এই বিদেশীয় বিপুল সভ্যতার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, অমনি দলে দলে

লোক সেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল। লোকের মনে এই ধারণা হইতে লাগিল যে, বিদেশীয় কাব্য-দর্শন, বিদেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, বিদেশীয় আচার-ব্যবহার সকলই ভাল। দেশীয় যাহা কিছু, সে সমস্তই অসঙ্গত, অসভ্য, কুৎসিৎ। এইরূপে দেশীয় আচার-ব্যবহারকে বলিদান করিয়া দেশে স্বাধীন চিন্তার যুগ প্রবর্ত্তিত হইল।

কি প্রকারে এই স্বাধীন চিন্তার উদ্বোধন হইয়াছিল, তাহা এতদ্দেশের ইতিহাসলেখকের পক্ষে একটি অনুসন্ধানযোগ্য ঘটনা। সেই সময় যে সকল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য শক্তিনিচয় কার্য্য করিয়াছিল, তাহা সবিশেষ বিবৃত হইলে—জাতীয় ইতিহাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি করিবে। ইংরেজী সভ্যতা যে এত সহজে এবং এমন গভীরভাবে এ দেশের মনে প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা কেবল কতকগুলি বাহ্যঘটনাপরম্পরার ক্রিয়া হইতে পারে না। ভারতবর্ষীয়দিগের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই শিক্ষা-বিস্তারের অনুকূল ছিল, নহিলে এমন বিপ্লব কখনও হইতে পারিত না। ফলটি যখন গাছে পাকিয়া উঠে এবং তাহার বোঁটাটি শিথিল হইয়া যায়, তখন তাহা সামান্য একটী পক্ষীর পদভরে খসিয়া পড়ে। এদেশের আচার, অনুষ্ঠান, রীতি, নীতি এমনই অসঙ্গত, অনাবশ্যক ও বাহুল্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকের মন শিক্ষার প্রথম বাতাসেই পুরাতন আশ্রয় ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

যে সকল বাহ্য কারণ এই ইংরেজী-সভ্যতা-বিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমি কেবল কয়েকটীর উল্লেখ করিব। সত্য থাকিলেই শুধু হয় না, তাহার প্রচারক চাহি; ধর্ম্ম থাকিলেই লোকে ধার্ম্মিক হয় না, তাহার পুরোহিত চাহি; এ দেশে ইংরেজী সভ্যতা-বিস্তারেরও তেমনি কয়েকজন প্রধান পুরোহিত বা প্রচারক জুটিয়া গেলেন। কলি-

শিক্ষক-এই নূতন সভ্যতার বর্ত্তি ধারণ করিলেন। ইহাঁদের নিঃস্বার্থ পরহিতচেষ্টা, অমায়িক ব্যবহার, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি দেশীয় যুবকবৃন্দের মন আকৃষ্ট করিল। সে আকর্ষণ এমন প্রবল যে, অনেক বাঙ্গালী ধর্ম্ম, কুল, আত্মীয়, স্বজন পরিত্যাগ করিয়া এই নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে যুক্তির খুব নিকট সম্বন্ধ। যে দেশে যখন স্বাধীন চিন্তার আরম্ভ হইয়াছে, সে দেশে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে যুক্তির উপর। সক্রেতিস্ যখন গ্রীকদিগের মন স্বাধীন চিন্তার বর্ত্মে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি যুক্তিকেই প্রধান আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং যুক্তির দ্বারা প্রাচীন মতের অসারতা দেখাইতে লাগিলেন। ইয়ুরোপের নবযুগে বেকন হইতে হিউম্ পর্য্যন্ত সকলেই যুক্তির উপর জ্ঞানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অবশ্য যুক্তি যে সকল সময়ে ধর্ম্মের অনুকূল হয়, তাহা নহে। যুক্তির সঙ্গে যখন ধর্ম্মের বিরোধ ঘটে, তখন নাস্তিক দর্শনের উৎপত্তি হয়; এবং তাহারই প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য আস্তিক দর্শনেরও সৃষ্টি হয়। সেই আস্তিক দর্শনের উদ্দেশ্য, ধর্ম্মের মূল সত্যগুলিকে যুক্তির দ্বারা রক্ষা করা। ইংরেজীশিক্ষার ঘাতপ্রতিঘাতে যখন লোকের ধর্ম্ম-বুদ্ধির মূল শিথিল হইয়া উঠিল, তখন যে যুক্তিমূলক, আস্তিকদর্শনের সৃষ্টি হইল, তাহাই "ব্রাহ্মধর্ম্ম।" ব্রাহ্মসমাজ যুক্তির উপরে হিন্দুধর্ম্মের সারস্বরূপ উপনিষদের সত্যগুলি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্মের সার সত্যকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—কেবল হিন্দুধর্ম্মের বাহিরের আবরণকে এবং জাঁকজমকপূর্ণ বহুঈশ্বরপূজাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও বেদান্তের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন, এবং বেদান্তের ঈশ্বরবাদের উপরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখনও

তত্ত্বে অনেক প্রভেদ। সে আলোচনা এস্থানে প্রাসঙ্গিক হইবে না। এস্থলে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ইংরেজী-সভ্যতা-বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। এমন কি, এই ব্রাহ্মসমাজে, খৃষ্টানদিগের অনুকরণে সাপ্তাহিক উপাসনা, সঙ্গীত ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সময় বুঝিয়া খৃষ্টান মিশনরীগণও ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুরের ইয়ুরোপীয় মিশনরীগণ ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশ করিয়া, দেশীয় লোকের আচার ব্যবহারের প্রতি বিদ্রূপবর্ষণ করিয়া লোকের মন হইতে পুরাতনের প্রতি অনুরাগ দূর করিয়া দিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রকাশিত করিয়া সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত ইঁহারা জ্ঞানের আলোক লইয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় পুস্তকপ্রণয়ন করায় খৃষ্টধর্ম্মের কিছু উপকার হউক না হউক, বঙ্গভাষার যে প্রভূত উপকার হইয়াছিল তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। মিশনরীরা যে কেবল ধর্ম্মপ্রচার করিয়া শিক্ষাবিস্তারের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন তাহা নহে। সময়ে সময়ে মিশনরীদের ভবনে যুবকগণের সান্ধ্য সমিতিও বসিত। নিষিদ্ধ খাদ্যে তাঁহাদের রুচিও সম্ভবতঃ এই স্থানেই অর্জ্জিত হইত।

শিক্ষাবিস্তারের আর একটী দ্বারস্বরূপ হইল সংবাদপত্র। বিলাতের এবং এই দেশের কোন কোন ভদ্রলোক সংবাদপত্র পরিচালন করিয়া শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ সুবিধা করিলেন। পরিশেষে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হইল, তখন স্বাধীনচিন্তার প্রকৃত উদ্বোধন হইল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এই নবযুগের একটী বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

২

ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও এ দেশে জ্ঞানের যে বর্ত্তি জ্বালিলেন, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইল না। তাঁহাদের স্বনামধন্য শিষ্যগণ এই কার্য্যে প্রাণ মন নিযুক্ত করিলেন। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রাম-

তনু লাহিড়ী প্রভৃতি তাঁহাদের কার্য্য করিতে লাগিলেন। এস্থলে আর একটী ঘটনার উল্লেখ করা উচিত মনে করি ; এই উন্নতি অথবা তথাকথিত উন্নতির দিনে আর একটী দিকে দেশীয় পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় সভ্যতার ভিত্তি দৃঢ় করা হইল। স্ত্রী-শিক্ষার কথা বলিতেছি। নূতন আদর্শের আলোকে স্ত্রীলোকের অজ্ঞতা বড়ই বিসদৃশ দেখাইতে লাগিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মহামতি বেথুন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় দেশীয় পণ্ডিত এবং অন্যান্য অনেক গণ্যমান্য লোক যখন ইহাতে উৎসাহদান করিলেন, তখন কি আর বলিতে হইবে যে ইংরেজী শিক্ষার পালে কিরূপ জোরে হাওয়া লাগিয়াছিল ?

এই সকল শক্তি সমাজদেহের উপর ক্রিয়া করিয়া সমাজকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। যুবকেরা দেশের আচারে বীতশ্রদ্ধ হইল। তাহারা শুধু দেশীয় আচার পরিত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, ভিন্ন দলের নিকট এই বিষয় লইয়া বড়াই করিয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। একবার জনকতক যুবক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বাজার হইতে মুসলমানের দোকানের মাংস কিনিয়া আনিয়া খাইতেছিল। তখন কৃষ্ণমোহন বাড়ীতে ছিলেন না। আহার শেষ হইলে মাংসের হাড়গুলি প্রতিবেশী হিন্দুদের বাড়ীতে ফেলিয়া দিয়া এই যুবকেরা চীৎকার করিতে লাগিল, "ওই গোহাড়, ওই গোহাড়।" এইরূপে উত্যক্ত হইয়া প্রতিবেশীরা কৃষ্ণমোহনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং কৃষ্ণমোহনের বাড়ীর লোকের উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিল ; ততক্ষণ এই যুবকগণ চম্পট দিয়াছেন। রাত্রিতে যখন কৃষ্ণমোহন, গৃহে ফিরিলেন, তখন সে গৃহে আর তাঁহার স্থান হইল না।

তখনকার শিক্ষিত-যুবকদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার এই খানেই শেষ নহে। সাহেবেরা মদ খায়, অতএব মদ খাওয়াই সভ্যতার লক্ষণ। অনেক

সুরাপান সম্বন্ধে এতই স্বেচ্ছাচারিতা ছিল যে, অনেক ভাল ভাল লোকও মদ্যপান করিতেন। রাজনারায়ণ বাবুর 'সেকাল ও একালে' এবং তাঁহার 'আত্মজীবনচরিতে' এই সময়ের একখানি উৎকৃষ্ট ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় নাকি নিয়মিত মদ্যপান করিতেন। রাজনারায়ণ বাবু ও সুরাপান অভ্যাস করিয়াছিলেন। অনেকে সুরাপান করাই কুসংস্কারবর্জ্জনের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন। এ দেশীয় লোকে সুরাপানকে মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং ঐ সুরাপান করিয়াই দেখাইতে হইবে যে, আমরা আর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীব নহি। এইরূপ ধারণা অনেক শিক্ষিত, সংস্কারার্থী লোকের মনে উদিত হইয়াছিল। এইরূপ করাকে অনেকে সৎসাহস-প্রদর্শন বলিয়া মনে করিতেন। আমি শুনিয়াছি, একজন শিক্ষাভিমানী নিজ পল্লীগ্রামে যাইবার সময় পাল্‌কীর উপরে মুরগী লইয়া যাইতেন। এইরূপ নির্ভীকতাকে লক্ষ্য করিয়াই ভূদেব বাবু লিখিয়াছিলেন:—"এখনকার দিনে দেশীয় শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় কিছুমাত্র সাহসিকতার প্রমাণ হয় না। সাহস অর্থে নির্ভীকতা। ভয়ের পাত্র কে? যাহার ইষ্টানিষ্ট করিবার শক্তি আছে, সেই ভয়ের পাত্র। এখন আমাদের সমাজ কাহারও তেমন কোন ইষ্টানিষ্ট করিতে পারেন না। এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে.........সুতরাং সমাজকে অপমানিত করায় পুত্রবৎসল পিতাকে অপমানিত করার ন্যায় পাপেরই প্রমাণ হয়—উহা সাহসের প্রমাণ হইতে পারে না।"

ভূদেব বাবু ইংরেজদের অনুকরণ করাকে নৈতিক ভীরুতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেশের আচার ব্যবহারকে উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া স্বাধীন চিন্তার নামে যখন যুবকগণের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসারবৃদ্ধি হইতেছিল, তখন যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা সমাজবন্ধনকে

পুনর্ব্বার দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভূদেব বাবু তাঁহাদের অন্যতম। মৃত মহাত্মা চন্দ্রনাথ বাবু এ বিষয়ে তাঁহার "আচার্য্য দেব" ভূদেব বাবুর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে মিশনারীদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, সুযুক্তির দ্বারা নিজ সম্প্রদায়ে টানিয়া লইয়াছিল, তখন কলিকাতার হিন্দুসমাজ নিশ্চিন্ত ছিল না। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দুগণ নানাপ্রকারে এই সংস্কারার্থীর দলকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। যুক্তি অপেক্ষা ইঁট পাথরই বোধ হয় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

ভূদেব বাবু প্রমুখ হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা যুক্তির বলে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে অভিলাষী হইলেন, যুক্তির দ্বারা যুক্তির উচ্ছেদসাধন করিতে লাগিলেন। হিন্দু ধর্ম্মে যাহা অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও অবান্তর, তাহা সমর্থন না করিয়া, ইঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মূল সত্য ও অনুষ্ঠানগুলিকে যুক্তির দ্বারা উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান করিতে লাগিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু এই কার্য্যকে একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি এই কার্য্যে নিয়োজিত করিলেনঃ—"আমাদের সম্মুখে বিরাট কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। সে বিরাট কাজ সম্পন্ন না করিলে আমরা আমাদের প্রাচীন বৈভবের গর্ব্ব করিবার অধিকারী হইব না। কিন্তু সে বিরাট কাজ সম্পন্ন করিতে বিপুল শক্তি, বিষম সাধনা, ব্যাপক কাল আবশ্যক। আমাদের ইতিহাসে আমরা আজ বড় বিষম স্থানে উপনীত।" (হিন্দুত্ব—ভূমিকা।)

এই কর্ত্তব্যের ধারণা করিতে হইলে, আমাদিগকে একটি গোড়ার কথা বুঝিয়া রাখিতে হইবে। এদেশে যখন ইংরেজী সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব হইল, তখন আমাদের সমাজ বলিতে যে একটা একীভূত (Homogeneous)

যে কঙ্কালটি দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার ভিতরে সজীবতা বা স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ছিল না। সমাজের এক অংশে আঘাত করিলে, অন্য অংশ সাড়া দিত না। সমস্ত সমাজ এক স্পন্দনে স্পন্দিত হইত না। সমাজের বিশাল দেহ নিয়মের কঠোর গ্রন্থিতে এমনই হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, অতি তীব্র আঘাতেও সে প্রবুদ্ধ হইত না। সুতরাং এই সমাজের এক অংশ যখন ইংরেজী শিক্ষার আবর্ত্তে পড়িয়া বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন অপরাংশ পূর্ব্বেরই মত নিশ্চল ও অসাড় রহিল। নব্য সমাজ বলিতে যে বিদ্রোহি-দলকে বুঝাইত, তাহার সংখ্যা অল্প হইলেও প্রভাব অধিক ছিল। ইহাদিগের ভিতর দিয়া সত্বরই হউক আর বিলম্বেই হউক, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাববে সমাজের সকল অংশে সংক্রামিত হইবে তহো সমাজের নেতৃগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং এই শিক্ষিত দলকে তাঁহারা উপেক্ষা করেন নাই।

অনেক হিন্দু হয়ত মনে করিবেন যে, চন্দ্রনাথ বাবুর চেষ্টা এই নব্য-সমাজের জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছিল, বৃহৎ হিন্দুসমাজের ইহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। এরূপ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যাহারা শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু ও হিন্দুত্বকে কেবল ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে, তাহাদিগের মনে ঘৃণার পরিবর্ত্তে অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দেওয়াও যেমন একটি কর্ত্তব্য, তেমনই আর একটি কর্ত্তব্য, হিন্দুধর্ম্মের মধ্য হইতে স্বধর্ম্মনিরত হিন্দুদিগের নিমিত্ত অনুরাগের ও শ্রদ্ধার সামগ্রী আহরণ করা। সমাজবন্ধন যেস্থানে শিথিল হইয়াছে, সেস্থানে সে বন্ধন দৃঢ় করা, এবং যেস্থানে দৃঢ় আছে, সেস্থানে তাহা চিরকাল দৃঢ় রাখিবার বন্দোবস্ত করা উভয়ই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। চন্দ্রনাথ বাবুর সমস্ত শক্তি এই কার্য্যে নিয়োজিত হইল।

কেহ কেহ এইরূপ চেষ্টাকে গোঁড়ামি বলিয়া মনে করিতে পারেন। হিন্দুয়ানীকে বাড়াইয়া তুলিবার বিপদ অনেক। হিন্দুধর্ম্ম এত পুরাতন

এবং তাহাতে কালক্রমে এত বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্ব আসিয়া মিলিত হইয়াছে, এত বিভিন্ন আচার পূজা পদ্ধতি আসিয়া ইহার অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য-সঞ্চার করিতে প্রয়াস পাওয়াকে কেহ কেহ উপহাসের বিষয় বলিয়া মনে করেন। এরূপ গোঁড়ামি তাঁহাদের নিকট অমার্জ্জনীয়। কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্মে গোঁড়ামি না হইলে চলে না। সাহিত্যে, দর্শনে, বা বিজ্ঞানে গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতে রাজি নহি; সে স্থানে সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এবং মনের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে; যদি আর কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিতে হইবে; আবশ্যক হইলে সমস্ত বিশ্বাসের আমূল পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ গোঁড়ামি-বিবর্জ্জিত চিত্তই জ্ঞানলাভের বিশেষ অনুকূল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম—যাহাতে জীবন মরণের সম্বন্ধ আছে—যাহা প্রাণের অপেক্ষাও অনেকের প্রিয়, তাহার সম্বন্ধে এরূপ উদারতা খাটে না। যাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস বদ্ধমূল হইবার অবকাশ পায় নাই, যাহারা ধর্ম্মের উপরের লহরীতে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ভিতরে অবগাহন করিয়া প্রকৃত সত্যের পরিচয় পায় নাই, তাহারাই উন্মুক্তচিত্ত, ও গোঁড়ামিশূন্য হইতে পারে, তাহাদের নিকট ধর্ম্মের আবেগমাত্রই গোঁড়ামি, সর্ব্বপ্রকার একাগ্রতাই তাহারা অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া মনে করে। যিনি ধর্ম্মের বিজয়-নিশান তুলিয়া আপন মাহাত্ম্য-প্রচারে যত্নশীল, যিনি আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহার কার্য্যকলাপ সাধারণ পরিমাপের বিষয়ীভূত নহে। সেই স্থানেই বেশী গোঁড়ামি দেখিতে পাই, যে স্থানে পরকীয় ধর্ম্মের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ লক্ষিত হয়, যেস্থানে অকারণে বা অল্প কারণে কটূক্তি ও বিদ্রূপ বর্ষিত হয়। চন্দ্রনাথ বাবুর রচনায় সেরূপ কথনও দেখি

নাই। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল হিন্দুত্বের গৌরব। তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাই আজীবন শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি যেন বলিতেছেন "তোমরা যাহা খুঁজিতেছ, আমি তোমাদিগকে তাহা মিলাইয়া দিব। পরের কাছে কেন যাইবে ? একবার ঘরের দিকে ফিরিয়া চাহ, একবার তোমার অতীতের দিকে নিরীক্ষণ কর, সবই আছে, ওগো সবই আছে। দেখ, এমন আর কোথায়ও আছে কি ?"

"হিন্দুর সোঽহং বলিতেছে, হিন্দুর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মদর্শী, ব্রহ্মভক্ত, ব্রহ্মাণ্ড-গ্রাহী, অপরিমিতসাহসসম্পন্ন, বিরাটমনা মনুষ্য পৃথিবীতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই।" (হিন্দুত্ব—সোঽহং)।

"হিন্দুর মন জগতের ছাঁচে ঢালা মন (Cosmically constituted), এমন বিরাট মন আর কি আছে ?" (হিন্দুত্ব—ভূমিকা)।

এমনই করিয়া তিনি অতীতের গৌরব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যে জাতি অতীতের গৌরব করিতে জানে না, তাহার ভবিষ্যৎও কখনও জয়যুক্ত হয় না।

কিন্তু এ গৌরব যখন একটা বৃথা গৌরবের সামগ্রী হইত তখন তিনি তাহার প্রশ্রয় দিতেন না। এ গৌরব ততক্ষণ উন্নতির অনুকূল, যতক্ষণ আমরা এ গৌরবের অধিকারী হইবার চেষ্টা করিব। "প্রাচীন বৈভবের গর্ব্ব করা মনুষ্যত্ব নয়, প্রাচীন বৈভব পুনর্লাভ করাই মনুষ্যত্ব।"

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, বাঙ্গালীর যাহা নিজস্ব গৌরব, তাহার দিকে তিনি আলোকপাত করিয়াছিলেন। নূতনত্বের চাকচিক্যে মুগ্ধ, অনুকরণ-লুব্ধ সমাজকে তিনি ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাচীনত্বের আবরণ উন্মোচন করিয়া চিরন্তন সত্যের রূপ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক আগ্রহে ও সরলতায়, তাঁহার বর্ণনা-কৌশলে হিন্দুর জীবন ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিও

পরিত্যাগ করেন নাই, হিন্দুজীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে তিনি একটা যুক্তি ও মহৎ সত্য বাহির করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি কড়াক্রান্তিটি পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই। ভগবান লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে কড়াক্রান্তিটি ছাড়েন না। সেই জন্য "হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তিটি পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই। কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।"

(হিন্দুত্ব—কড়াক্রান্তি।)

চন্দ্রনাথ বাবু অবশ্য সমস্ত বিষয়ের সমর্থন করেন নাই। হিন্দুয়ানীর মধ্যে বাড়াবাড়ি আছে, ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলেও একান্ত ধর্ম্মানুরাগ যে তাঁহাকে পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিল, এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিকে চন্দ্রনাথ বাবু ধর্ম্মের দিক হইতে—কঠোর কর্ত্তব্যের দিক হইতে দেখিয়াছিলেন। শুধু তিনি যে, ইহাকে একটি তত্ত্ব বলিয়া মানিতেন, তাহা নহে, তাঁহার পারিবারিক ও বাহিরের জীবনেও তিনি এই সত্যের দ্বারা পরিচালিত হইতেন। বিধাতার কাজ করিতেছি এই মনে করিয়া তিনি গবর্মেণ্টের চাকরী করিতেন। কি অপত্যস্নেহে, কি বন্ধুবাৎসল্যে, কি দাম্পত্য প্রেমে তিনি সর্ব্বত্র বিধাতার হস্ত অনুভব করিতেন, ধর্ম্মের দিক দিয়া এই দৈনন্দিন ব্যাপারগুলিকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থায় সংসারে অবস্থান করিতেছিলেন।

ধর্ম্মের সহিত আধ্যাত্মিক সূত্রে জীবন-ব্যাপারগুলি গ্রথিত করিয়া তিনি লোকশিক্ষার ও শিথিলতাগ্রস্ত সমাজ বন্ধনের যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাতে যুগপৎ আমাদের ভক্তির ও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। কার্লাইল যেমন তাঁহার সমসাময়িক ইংরেজ সমাজকে ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপের দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথ বাবু শুধু সেরূপ করেন নাই।

তিনি প্রাচীন আদর্শের ভিত্তির উপর হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার এক বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু আচার ও সামাজিক প্রবন্ধে এবং চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার "সংযম-শিক্ষায়," "ত্রিধারা," "কঃপন্থা" এবং "হিন্দুত্বে" যে আদর্শ লোকের সমক্ষে ধারণ করিলেন, তাহাতে পরিবর্ত্তনের স্রোত যে অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, নূতনত্বের মোহ যে অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই।

অবশ্য চন্দ্রনাথ বাবুর এই সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর নাও হইতে পারে,—সেরূপ আশাই করা যায় না—কিন্তু সামাজিক বিপ্লবের সময় যে সকল বীর-হৃদয় মনস্বী মহাপুরুষ অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরণোপান্তে উন্নতিকাম মানবমাত্রই প্রণত হইবে।

আজ কাল আমরা প্রত্যেকেই এক এক জন ক্ষুদ্র বৃহৎ সমাজ-সংস্কারক। আমরা কোনও একটি বিষয়কে লইয়া তাহারই দোষগুণ দেখিতে প্রবৃত্ত হই; এবং বিদেশীয় সমাজের অনুকরণে তাহার একটা না একটা সংস্কার নিশ্চয়ই সাব্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারি। বাল্য বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই এক একটা মত আছে, এই সকল মত লইয়া সংস্কার করিতে হইলে সংস্কারের সংখ্যারই অন্ত থাকে না। ইহা আমাদের একদেশদর্শিতার ফল। আমরা সমাজকে পূর্ণ ভাবে প্রত্যক্ষ করি না, কেবল অংশমাত্র দেখিয়া তাহার সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হই; কাযেই সংস্কারও হয় না, সমাজও বিবাদ-বিতণ্ডায় অস্থির হয়। বাল্য বিবাহ সম্বন্ধেই ইহা দেখা যাইতে পারে। কোন একজন বা দশজন ডাক্তার বলিলেন যে, বাল্য বিবাহ দেশের অহিত করিতেছে, অমনই বাল্যবিবাহের সংস্কার আরব্ধ হইল। এমন কতবার হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু ফল বেশী কিছু হইয়াছে কি? আমার মনে হয়, তাহার কারণ

এই যে, বাল্য বিবাহ সমাজের অন্যান্য অংশের সহিত জড়িত বলিয়া সে সকল অংশের সংস্কার ব্যতিরেকে বাল্য বিবাহের সংস্কার কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। একান্নবর্ত্তী পরিবার যতদিন থাকিবে, ততদিন একটি ছোট মেয়েকে এক পরিবার হইতে অন্য পরিবারে লইয়া লালন পালন করিয়া তাহাকে সর্ব্বাংশে সেই পরিবারের কন্যার মত করিয়া লইবার চেষ্টা থাকিবে। একটি বড় মেয়েকে লইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পোষ্যপুত্র গ্রহণের বেলায়ও ঐরূপ ছোট ছেলেকে গ্রহণ করার রীতি আছে। তাহার পর, পিতা মাতা বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিবার রীতি যতদিন পর্য্যন্ত থাকিবে, স্ত্রীপুরুষের সাক্ষাৎ হইয়া বিবাহ হইবার প্রথা যতদিন না চলিতেছে, ততদিন বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দেওয়া কঠিন হইবে।

আমি একটি মাত্র উদাহরণ দিলাম, এরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। হিন্দুসমাজ ধর্ম্মপ্রাণ, কাজেই ধর্ম্মের মধ্য দিয়া ইহার যে সংস্কার হইবে তাহাই স্বাভাবিক ও স্থায়ী হইবে, এইরূপ ধারণায় প্রণোদিত হইয়া চন্দ্রনাথ বাবু এক বিরাট ধর্ম্মসমাজের কল্পনা করিয়াছিলেন। এরূপ সমাজ পৃথিবীর মধ্যে অপূর্ব্ব বস্তু, কামনার বস্তু, সমস্ত জগৎসমাজের শীর্ষ-স্থানীয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

হিন্দুসমাজ অধঃপতিত, ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া তিনি কখনও নৈরাশ্য প্রকাশ করেন নাই। নৈরাশ্য উন্নতির অন্তরায়, তাই তিনি নৈরাশ্যকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, শুধু আশার বাণী, আশ্বাসের বাণী। হিন্দুরা বড় বৈরাগ্যপ্রিয়। দুঃখের অংশটাই তাঁহারা বাড়াইয়া তুলিতেন; ইয়ুরোপীয় দার্শনিকেরা পর্য্যন্ত হিন্দুদিগকে Pessimist বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এখনও এ বৈরাগ্য, এ দুঃখের একান্ত উপলব্ধি আমাদের আত্মাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, এবং আমাদের কর্ম্মের প্রস্রবণকে জমাইয়া ফেলিয়াছে। সেই জন্যই হিন্দু অসাড়, অলস,

জড়তাপন্ন। কিন্তু হিন্দুদের এই মজ্জাগত Pessimismএর মধ্যে Optimism ও ছিল। এই Optimism এর প্রধান উপাদান পরকালে বিশ্বাস। পরকাল আছে বলিয়াই দুঃখ সহনযোগ্য। পরকাল আছে বলিয়াই শোক, জরা, মৃত্যুকে হিন্দু তুচ্ছ মনে করিতে পারিত। পরকালই দুঃখে সান্ত্বনা, সুখে ধৈর্য্য, ক্রোধে ক্ষমা, প্রতিহিংসায় মার্জ্জনা আনিয়া দেয়। চন্দ্রনাথ বাবুর Optimism এই পরকালবাদেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে এমন Optimism যে তাহাকে পুত্রশোক পর্য্যন্ত বিচলিত করিতে পারিত না। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু এই পরলোকের ছায়ায় চিরসান্ত্বনা লাভ করে। চন্দ্রনাথ বাবুর পরলোকে বিশ্বাস কিরূপ জীবন্ত ও আন্তরিকতা-পূর্ণ, তাহা তাঁহার 'পৃথিবীর সুখ দুঃখের' ভূমিকা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। নিষ্ঠাবান হিন্দু তাঁহার পরলোকগতা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া যে কয়েক ছত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস কি সহজে মিলে? যে দিকে তিনি চাহিয়াছেন, সেই দিকে বিশ্ব তাহার সুষমাসম্ভার লইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছে। তিনি কোন জিনিষের ভাল দিক্ দেখিতে পাইলে কখনও তাহার মন্দ দিক্টা দেখিতে চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর সবই ভালর জন্য করেন। তিনি এই আশায় ও বিশ্বাসে শেষ পর্য্যন্ত সুখী ছিলেন। 'পৃথিবীর সুখদুঃখের' প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার এই আত্মতৃপ্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইয়ুরোপীয় সমাজ পরলোককে দূর হইতে দূরে নির্ব্বাসিত করিতেছে, কাযেই ইহকাল লইয়া মত্ত হইয়া আছে। হিন্দু কখনও ইহকালের পার্থিব পন্থায় তৃপ্তিলাভ করিবে না। চন্দ্রনাথ বাবু বলেন "যদি মরিতেই হয়, তবে পরকাল লইয়া মরা অপেক্ষা ইহকাল লইয়া মরায় মনুষ্যের অনিষ্ট, অপমান ও অগৌরব অনেক অধিক।" (কঃ পন্থা—১৩ পৃষ্ঠা)। হিন্দু পরকালের পন্থা ধরিয়া দরিদ্রভাবে চলিয়াছে, ইয়ুরোপ ও আমেরিকা

ইহকালের পন্থা ধরিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, কিন্তু পরিণামে হিন্দুই জয়লাভ করিবে। এইস্থানেই চন্দ্রনাথ বাবুর Idealism. এই কল্পনায় প্রতিভাত উন্নতি ও গৌরবের রাজ্য বাস্তব হইতে তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। তাই তিনি দোষানুসন্ধান না করিয়া বলিয়াছেন:—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। আমাদের যে সহস্র ত্রুটি, সহস্র অপরাধ তাহা মার্জ্জনা করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান-গৌরব-মণ্ডিত বাঙ্গালী জাতির একখানি সুস্পষ্ট সুন্দর মূর্ত্তি আমাদের চক্ষুর সমক্ষে ধরিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বসুর মূল কথাগুলির আলোচনা করিতে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। আরও অনেক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া যাইবে ভয়ে সে কথাগুলি বলা হইল না। চন্দ্রনাথ বাবুর পুস্তকগুলির সমালোচনা করিবার সময় আইসে নাই। ভাষার উপর তাঁহার কতখানিপ্রভাব, এবং চন্দ্রনাথ বাবুর রচনা স্থায়িত্বলাভ করিবে কি না, এ সকল বিষয় এখন স্থির করিয়া বলা কঠিন। তবে বঙ্গভাষার প্রতি, বাঙ্গালার প্রতি; বাঙ্গালা-দেশের প্রতি তাঁহার যে একান্ত অকৃত্রিম অনুরাগ, যাহা তাঁহার লেখার নানাস্থানে নানাভাবে পরিস্ফুট ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা বিরল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সাবিত্রীচরিত্রের মাহাত্ম্য-বর্ণনা করিতে, অভিজ্ঞান শকুন্তলের মাধুর্য্য-বর্ণন করিতে, সংযম-শিক্ষার বিভিন্ন স্তর-প্রদর্শন করিতে, তাঁহার সেই একই স্বদেশপ্রেম, একই ধর্ম্মবিশ্বাস, একই গৌরবের আশা আত্ম-বিকাশ করিয়াছে।

'শকুন্তলা-তত্ত্ব'ই অনেকের মতে চন্দ্রনাথ বাবুর শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। চন্দ্রনাথ বাবু 'হিন্দুত্বের' ভূমিকায় নিজেও সে আভাস দিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শনে' অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সমালোচনাই চন্দ্রনাথ বাবুর বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থ

রচনা করিবার প্রথম সোপান। তাঁহার আত্মজীবনচরিতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "শকুন্তলাতত্ত্ব লিখিবার পর সরকারী কার্য্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরেজী লিখি নাই, লিখিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই—এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা হইয়াছে। লিখিতে হইলে মাতৃভাষায় লেখার ন্যায় অন্য কোন ভাষায় লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নহে।" 'শকুন্তলাতত্ত্ব' বঙ্গদর্শনে লিখিবার পূর্ব্বে একখানি ইংরেজীপত্রে তিনি কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা করেন, তাহাই দেখিয়া বঙ্কিমবাবু চন্দ্রনাথবাবুকে 'বঙ্গদর্শনে' লিখিবার জন্য "পীড়াপীড়ি" করেন। 'বঙ্গদর্শনের' সহিত তাঁহার এই যে একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল, এবং এই সূত্রে বঙ্গসাহিত্যের সহিত যে একটি প্রীতিকর বন্ধন গ্রথিত হইল, আজীবন সে পরিচয় তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই, সে স্নেহবন্ধন তিনি শিথিল হইতে দেন নাই।

ভাষার পবিত্রতা ও গৌরব রক্ষা করিয়া তিনি একান্ত মনে তাহার সেবা করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবুর ভাষা প্রাঞ্জল, ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। সরল কথাকে অনর্থক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জটিল করিয়া তুলিবার প্রণালী তাঁহার ছিল না। যাহাতে সাধারণ লোকে সহজে বক্তব্যবিষয়ের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, এজন্য তিনি সমাসবাহুল্য এবং সংস্কৃতবাক্য- বিন্যাসের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার ভাষায় একটা সহজ প্রফুল্লতা ও বাধাহীন স্রোত ছিল। চন্দ্রনাথ বাবু সমালোচক বা Reviewer ভাবে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহার সমস্ত লেখায় তিনি এই সমালোচনার ভাবই রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনা, সমাজপ্রণালীর সমালোচনা, লোকচরিত্রের সমালোচনা, ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। সমালোচনায় তিনি অশেষ পাণ্ডিত্যও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা

তিনি সমস্ত বিষয় যাচাই করিয়া, পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। এই মহান্ আদর্শের জন্যই তাঁহার সমালোচনা এক জীবন্ত কাব্যের মত হইয়া উঠিয়াছে। রাস্কিনের ললিত-কলার সমালোচনার মত চন্দ্রনাথ বাবুর সমালোচনা এক মহতী সৃষ্টিকরী কল্পনার আলোকে প্রতিভাত, পরিব্যাপ্ত, ব্যক্ত। উভয়ের সম্বন্ধেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, সে আদর্শ ছাড়িয়া দিলে সে সমালোচনা নিতান্তই নীরস ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে।

চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্গসাহিত্যকে যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রচুর না হইলেও মূল্যবান্। রাজকার্য্যের অবসরে তিনি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত উপাদান সংগ্রহ করিতেন, এবং তাঁহার নূতন কিছু বলিবার থাকিলেই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন। অনাবশ্যক রচনায় সময় কাটাইবার অবসর বা প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি 'পৃথিবীর সুখদুঃখের' পূর্ব্বভাষে বলিয়াছেন :—"আমার বাঙ্গালা লিখিবার এই একটা রীতি বা নিয়ম আছে যে, বাঙ্গালায় যাহা কেহ কখনও লেখে নাই, এমন ভাল কথা বলিবার থাকিলেই আমি লিখি, নহিলে লিখি না। এই-জন্য আমি লিখিয়া গেলাম বড় অল্প, কিন্তু যাহা লিখিয়া গেলাম, এদেশে তাহা আর কেহ লেখেন নাই।" ইহা স্পর্দ্ধার কথা নহে—স্পর্দ্ধা হইলেও এই শ্রেষ্ঠকবিজনোচিত স্পর্দ্ধা সাহিত্য চিরকাল মার্জ্জনা করিয়া থাকেন—কিন্তু ইহা গর্ব্ব নহে। এই কথা কয়েকটি একজন সাহিত্য-সেবা-ব্রতে ব্রতী, নিরহঙ্কার, কঠোর-সংকল্প-সাধন-প্রয়াসীর আত্মনিবেদন। এইরূপ করিয়াই চন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বাবু সাধারণকে যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত আমি তাহারই কথা বলিয়াছি, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের পূর্ণতা ইহাতে নহে। বস্তুতঃ পরিবারের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেইখানে তাঁহার গৌরব এবং তথায়ই তাঁহার চরম সার্থকতা। নিজ পরি-

বারের নানাবিধ সম্বন্ধের মধ্যেই এই সাধুপুরুষের জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বাহিরের আড়ম্বরের মধ্যে আসিতে চাহিতেন না। তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, আত্মপরিচয় দিবার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন না। অনেকের সহিত তিনি মিশিতেন না; যাঁহাদের সহিত মিশিতেন, তাঁহাদের সহিত তন্ময় হইয়া মিশিতেন—একটুও ফাঁক রাখিতেন না। ধনী লোকের সংসর্গে নিজের গর্ব্ব চরিতার্থ করিবার সুযোগ হইলেও, এই দরিদ্র সাহিত্যসেবী কথনও সে সুযোগ গ্রহণ করিতেন না, পাছে তাঁহার সাধনা শিথিল ও ব্যর্থ হইয়া যায়। তাঁহার পারিবারিক জীবন এমন সরল ও অমৃতময় ছিল যে, তাহাতেই তিনি তাঁহার সমস্ত সাধের তৃপ্তি—সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা দেখিতে পাইতেন।

এইরূপ পারিবারিক বন্ধনে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া তিনি নীরবে, নিভৃতে, ধর্ম্মসাধনা, সাহিত্যসাধনা, ও সংযমসাধনা করিতেন। এই সাধনায় তিনি কথনও বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে তিনি অন্তর্ম্মুখী করিয়া লইয়া তাহারই তৃপ্তিসাধনে তাঁহার সমস্ত কল্পনার পরিণতি—সমস্ত বাসনার পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাহিরের কোনও আকর্ষণই তাঁহার মনে রেখাপাত করিতে পারিত না। সেই জন্য দারিদ্র্যের ও সম্পদের মধ্যে তিনি তুল্যভাবে স্বাধীনচিত্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন। বহুকাল সরকারী অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বাধীনচিত্ততার জন্য উচ্চপদস্থকর্ম্মচারীর নিকট হইতে যশঃ অর্জ্জন করা কি কম সৌভাগ্যের কথা? সেই দুর্লভ সৌভাগ্য চন্দ্রনাথবাবুর পক্ষে ঘটিয়াছিল; কেন না, তিনি বাহিরের আকর্ষণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। যে ব্যক্তি সুখলব্ধ বিশ্রামের ভক্ত, যে বিলাসিতার বাধ্য, যে ধন ও তাহার আনুসঙ্গিক উপকরণে মত্ত, সে কেমন করিয়া স্বাধীন থাকিবে? চন্দ্রনাথ বাবু বাহিরের বস্তুকে অনিত্য বলিয়া মনে করিতেন, কাযেই

অভাবকে তিনি কখনও অভাব বলিয়া গণ্য করিতেন না। বিলাসের মাদকতা তাঁহাকে কখনও মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি বলিতেন "বিলাসের ন্যায় মনোহর শত্রু আর নাই।" (কঃ পন্থা)। বিলাসকে সেই জন্য তিনি বর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রকৃত বেদান্তবাদীর ন্যায় তিনি নিত্যসত্যের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, কাযেই বেশভূষার দিকে একেবারে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। পারিবারিক দুর্ঘটনায়ও তিনি এই বৈদান্তিকোচিত ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ছোট ছেলের মৃত্যুর সময়ে তিনি কি প্রকার মানসিক স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন একটি দুষ্টব্রণে অস্ত্র করিয়া দেওয়ায় তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রতিদিন তাঁহার পুত্রের সংবাদ লইতেন, এমন সময় পুত্রটির মৃত্যু হইল। ডাক্তার, চন্দ্রনাথ বাবুর অন্য পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আর কয়েকদিন ছোট ছেলেটি না বাঁচিলে চন্দ্রনাথ বাবুর জীবন রক্ষা করা কঠিন হইবে। ছেলেটি চিররুগ্ন ছিলেন, এজন্য চন্দ্রবাবুর স্নেহ তিনিই অধিক পরিমাণে পাইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু রোগশয্যায় শুইয়া যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রটি অনন্তধামে চলিয়া গেল, তখন তিনি পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "আমার জন্য তোমরা ভাবিও না। আমি শোক সহ্য করিতে পারিব। সে বড় কষ্ট পাইতেছিল, ভগবান্ তাহার কষ্টের অন্ত করিয়া দিয়াছেন, আমি আমার নিজের ক্ষতি সহিতে পারিব না? আমার জন্য ভাবিও না। তোমাদের মাতাকে শান্ত কর গিয়া।" কি অপূর্ব্ব সাধনার বলে তিনি এই আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ক্ষুদ্র মানব,—আমরা ভাবিয়াও পাই না। ঈশ্বরের বিধানের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; অতি গুরুতর শোকেও তিনি এ বিশ্বাস তিলেকের জন্য টলিতে দেন নাই। এইরূপ অপূর্ব্ব ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরলোকে বিশ্বাস, হিন্দুত্বে বিশ্বাস, জাতীয় উন্নতিতে বিশ্বাস, চারিত্র-মহত্ত্বে বিশ্বাস ও

সাহিত্যের গৌরবে বিশ্বাস লইয়া তিনি সুখ ও শান্তির বিচিত্র আশ্রয় রচনা করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃস্নেহ, অপত্যস্নেহ, দাম্পত্যপ্রেম, বন্ধুস্বজনবাৎসল্যের আদর্শ হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারকে প্রমোদ-উদ্যানে পরিণত করিয়াছিলেন। পরকালে যদি চারিত্রগৌরবের পুরস্কার থাকে, যদি সৌম্য, শান্ত, নির্ম্মল প্রকৃতির চরিতার্থতা থাকে, তাহা হইলে চন্দ্রনাথের অনন্ত জীবন জয়যুক্ত হইবে। আর ইহকালে যদি এই লুব্ধ, মুগ্ধ, বাসনাদগ্ধ সংসারে সত্যের আদর থাকে, যদি কঠোর সাধনার সফলতা থাকে, তবে চন্দ্রনাথের স্মৃতি গৌরবমণ্ডিত হইবে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

শোক-সভার কার্য্য-বিবরণ।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি এল্ মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশার্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল :—

গত ৫ই ভাদ্র (১৩১৭) ইংরাজি ২১শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণে পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুর পরলোক গমনে একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত বরদাদাস বসু, শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শৈলজানাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভারম্ভে সভাপতি মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, ৺চন্দ্রনাথ বসুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই সভা আহূত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় অদ্বিতীয়

ছিলেন। বঙ্কিম বাবু যখন "বঙ্গদর্শন" বাহির করেন তখন তিনি চন্দ্রনাথ বসু ও আরও কতিপয় বন্ধুর নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং এই বঙ্গদর্শনকে বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের ভিত্তি-স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সমগ্র প্রবন্ধ এই পুস্তিকায় মুদ্রিত হইল।

তৎপরে সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, চন্দ্রনাথ বসু শরীরী ভাবে আমাদের মধ্যে বিগুমান নাই বটে কিন্তু তাঁহার আত্মা চির-দিন বঙ্গদেশে বিরাজ করিবে। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বাবুর মতামত লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে এ বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। অগুকার প্রবন্ধ লেখক দার্শনিক সাহিত্যসেবী ও সুলেখক; অগুকার প্রবন্ধ তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি আট ঘাট বাঁধিয়া অথচ সতেজে বলিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ তেজই যথার্থ তেজ। এই প্রবন্ধে যাঁহার পবিত্র জীবনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাঁহার তেজও এইরূপ সঙ্গত তেজ ছিল। এরূপ মণিকাঞ্চন সংযোগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্রনাথ বাবু ইংরাজিতে ও বাঙ্গালাতে যতদূর সম্ভব কৃতবিগু ছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে চিৎপুরস্থ ব্রাঞ্চ ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। আমি সেই সময়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িতাম। চন্দ্রনাথ বাবু আমা অপেক্ষা এক শ্রেণী নিম্নে পড়িতেন বটে, কিন্তু তিনি সেই সময়ে সর্ব্ব পরিচিত ছিলেন। তিনি ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং বি এ পরীক্ষাতে তিনি প্রথম স্থান ও রাসবিহারী

বাবু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ঘরে ও বাহিরে অনেক কাজ করিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবু অসাধারণ সদ্বক্তা ছিলেন কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করিতে তিনি পছন্দ করিতেন না বাহিরে ও দূরে থাকিয়া তিনি কাজ করিতে ভাল বাসিতেন।

সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম এবং নানা প্রকার ওজর আপত্তির পর তিনি এ পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

জীবনের শেষ ভাগে তিনি কিছু শোক পাইয়াছিলেন ও রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। তাঁহার কার্ব্বাঙ্কলে অস্ত্র প্রয়োগের পর তাঁহাকে পূর্ব্বের মতই প্রশান্তমুখ দেখিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনী আলোচনা কেবল তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নহে, আমাদের শিক্ষার জন্যও দরকার। তাঁহার পুত্রগণ যদি তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের কোনও পুস্তক লেখেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আত্মার ভিতর পরমাত্মার স্ফূর্ত্তি না হইলে চন্দ্রনাথ বাবু যে সমস্ত কাজ করিয়াছেন সে সমস্ত কাজ করা সম্ভবপর নহে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে চন্দ্রনাথ বাবুর জন্য পরিষদের এই শোক-সভাতে যোগদান করিতেছি ও প্রবন্ধ লেখককে প্রবন্ধ লেখার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই তিনি বাঙ্গালা ভাষাতে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং সেই জন্য আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অভাব প্রভৃতি নির্ভীকভাবে সমালোচনা করিতেন। তাঁহার সময় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ইংরাজিতে লেখাই পছন্দ করিতেন কিন্তু তিনি নিজে এ বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর পদানুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত শকুন্তলা-তত্ত্ব এক অমূল্য গ্রন্থ। শকুন্তলা চরিত্রের এরূপ সমালোচনা জগতের

সাহিত্যের মধ্যে এক অতি শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবে। তিনি এই এক গ্রন্থ লিখিলেই অমর হইতেন। এই গ্রন্থ অনেক ভাষায় অনূদিত হওয়া উচিত। তিনি সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন এবং পরিষদের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। হিন্দুত্ব ও হিন্দু আদর্শের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ শ্রদ্ধা বঙ্কিম বাবুরও ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত দুইটী প্রস্তাব সভাস্থলে উপস্থিত করেন সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাব দুইটী গৃহীত হয়—(১) বঙ্গ সাহিত্যের গৌরবস্থল ও অনুরক্ত সেবক, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও বিশিষ্ট সভ্য, বিচক্ষণ সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গ ভাষাকে বিবিধ সম্পদে সম্পন্ন করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা সমাজের অসাধারণ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও শোকার্ত্ত পরিষৎ আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনগণের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

(২) পরিষদের ভূত-পুর্ব্ব সভাপতি চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংকল্প করিতেছেন; পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আবশ্যক ব্যবস্থা করিবেন।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ অর্পণ করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

পাইকপাড়া ও কান্দী রাজবংশ

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি. এল্.

কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত

জেমো কান্দী
মুরশিদাবাদ
১৩১৭

COTTON PRESS

PRINTED BY JOTISH CHANDRA GHOSH

57, Harrison Road, Calcutta.

পাইকপাড়া ও কান্দী রাজবংশ

পাইকপাড়া ও কান্দী রাজবংশ উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের একপ্রকার নেতা। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও লালা বাবুর নাম বঙ্গদেশে বহুদিন হইতে সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে। দানশীলতা ও ধর্ম্মপ্রবণতায় এই বংশ সকলের নিকট সম্মানিত। লালা বাবুর স্বার্থত্যাগ ও অক্ষয় কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। যতদিন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশে বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন গঙ্গাগোবিন্দের নাম বঙ্গদেশীয়দিগের স্মৃতিপথের বহির্ভূত হইবে না। লর্ড কর্ণওয়ালিসের অক্ষয়কীর্ত্তি গঙ্গাগোবিন্দের সহিত ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সহিত বিজড়িত; এজন্য এই রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

কান্দী রাজবংশ অনাদিবর সিংহের অধস্তন জীবধর সিংহ হইতে প্রাদুর্ভূত। অনাদিবর সিংহ অযোধ্যা হইতে আগমন করিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। অনাদিবর সিংহ হইতে জীবধর পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের বিবরণ সূচীতালিকায়

"বিদ্যাবিনয় সম্পন্নাঃ সন্তঃ শ্রীকরণান্বয়ঃ।
অযোধ্যা মথুরা মায়াপুরীভ্যঃ প্রাক্সমঞ্চিতাঃ ॥
পূর্ব্বোঽনাদিবরঃ সোমস্তথৈব পুরুষোত্তমঃ।
সুদর্শনো দেবদত্ত এতে পঞ্চ যশস্বিনঃ ॥
বাৎস্যঃ সৌকালিনশ্চৈব মৌদ্‌গল্যশ্চ ততঃপরম্।
বিশ্বামিত্রঃ কাশ্যপশ্চ গোত্রমেষাং ক্রমাদ্বিজঃ ॥
সিংহো ঘোষশ্চ দাসশ্চ মিত্রো দত্তশ্চ পঞ্চমঃ।
ইমে পদাধনঃ পঞ্চ পঞ্চ গোত্রাভিসূচকাঃ ॥
সিংহ ঘোষাবযোধ্যায়া দাসশ্চ মথুরাপুরাৎ।
মায়াপুরীং পরিত্যজ্য মিত্র দত্তৌ তথা যযুঃ ॥
ততঃ কাশ্যপ শাণ্ডিল্যৌ দাসঘোষৌ সাসত্যচ। (?)
ভরদ্বাজ করাভ্যাস্তু সহিতৌ পঞ্চ সংগতৌ ॥

* * * * *

অথ সিংহেশ্বরগ্রামে সিংহোঽনাদিবরোঽবসৎ।
কীর্ত্তিমানতুলপ্রজ্ঞঃ স্থাপকঃ শিবলিঙ্গয়োঃ ॥
সরোবর প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণাতিথি পূজকঃ।
দেবার্চ্চনারতো দাতা স্বজাতিপরিপালকঃ ॥
তস্মাৎ সূর্য্যধরোজাতঃ পিতৃমার্গানুসারকঃ।
তৎসুতো বিশ্বরূপোঽভূৎ কুলতো বিশ্ববীক্ষিতঃ ॥
বিশ্বরূপাৎ বরাহোঽভূৎ তস্মাৎ মদন ভৈরবৌ।
সুরাপানাদবৈধাচ্চ বিদ্বিষ্টাশ্চাশ্ববিক্রয়াৎ ॥
ভৈরবেন কৃতশ্রাদ্ধো নিন্দিতোঽপি স্ববন্ধুভিঃ।
কালিকা বরমাসাদ্য রাণোপাধি বিভূষিতঃ ॥

মদনো মদনপ্রায়ো জাজিগ্রামাধিপোঽভবৎ।
ভৈরবাড্ডোমনোজ্জাতঃ এমনস্তৎ সুতোত্তমঃ॥
তস্মাৎ লক্ষ্মীধরোজজ্ঞে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীধরোপমঃ।
গুণাধারোঽপি সংক্ষুব্ধো কৃতোঽধ্যাত্তে বিড়ম্বিতঃ॥
ধীরঃ সদসি বিখ্যাতঃ করণানাং গুরুম্বিতি।
তস্যপুত্রাস্ত্রয়ঃ খর্ব্বমানো জ্যেষ্ঠ গদাধরঃ॥
বঙ্গান্ ভগীরথো যাতঃ কনিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠতাং গতঃ।
করোতি ব্যাসনামায়ং শুদ্ধকীর্ত্তিং সুবিশ্রুতঃ॥
সর্ব্বে জানন্তি কর্ম্মাণি দুষ্করাণ্যস্য ধীমতঃ।
স্বজাত্যৈপরমঃ পূজ্যঃ ভক্তিনিষ্ঠঃ কুলেশ্বরঃ॥
নির্ম্মমে বসতিং রম্যাং নাম্না ব্যাসপুরং মুদা।
ব্যাসাজ্জাতৌ বামদেবো বনমালীচ সুশ্রুতঃ॥
পতিতো বামদেবোঽভূদ্গোপকন্যা পরিগ্রহাৎ।
কল্যাণপুর ক্রান্দ্যাং স উবাস চ তন্নাসহ॥
ত্যক্ত্বা স্ববসতিগ্রামম্ ধিক্‌কৃত্যচাগ্রজম্।
কনিষ্ঠো বনমালীতু ময়ূরাক্ষী তটস্থিতম্॥
বনং ছিত্বা বসৎ কান্দীপুরে সিংহো নরেন্দ্রবৎ।
প্রসিদ্ধশ্চাভবৎ তত্র বহুমানী কুলেশ্বরঃ॥
শিবলিঙ্গ ত্রয়ং বিষ্ণুং লক্ষ্মীনারায়ণং শিলাম্।
প্রতিষ্ঠাপ্য খনিত্বাচ সরাংসি বিবিধানিচ॥
চকার চ নিজাবাসং গৃহং রম্যং মহোদয়ঃ।
কেশবঃ শ্রীপতিশ্চাস্মাৎ জজ্ঞাতে তনয়ৌ শুভৌ॥
সাধনৈর্বিবিধৈঃ সিদ্ধিরাসীৎ কেশব সূরিণঃ।
বারাণস্যাং [illegible] পরমাং গতিম্॥

কেশবাৎ তনয়োজাতঃ খ্যাতো রাজা বিনায়কঃ।
প্রতাপে পালনে দানে বিপ্রভক্তৌ সদারতঃ॥
দিব্যমতিথিশালাং স প্রতিষ্ঠাপ্য যথাবিধিঃ।
পরিপোষ্যচ দীনাদীন্ প্রাপদেশশ্রুতং যশঃ॥
কান্দীশঃ প্রথমস্তস্য পুত্রো জজ্ঞে মহামতিঃ।
গোপালপূর্ত্তি রাজাখ্যঃ সর্ব্বলক্ষণ সংযুতঃ॥
দ্বিতীয়স্তনয়ঃ শ্রীমান্ রাজা লক্ষ্মীধরস্ততঃ।
প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ সুপটু রাজকর্ম্মসু॥
তস্যপ্রথম পত্ন্যাস্তু জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
রুদ্রো দামোদরো বিদ্যাধরশ্চেতি বিচক্ষণাঃ॥
কান্দীশস্তত্র বৈ রুদ্রো রুদ্রসেবাপরায়ণঃ।
লেভে কৃতার্থতাং তূর্ণং রুদ্রদেব কৃপাশ্রিতঃ॥
শাস্ত্রপারাগতঃ খ্যাতো দামোদর উদারধীঃ।
ইষ্টানিষ্টৌ দ্বিজাদ্বিষ্টৌ বিশ্রুতো রাঢ়মণ্ডলে॥
ততো জাত্যন্তরীভূতো ভ্রষ্টো বিদ্যাধরোঽভবৎ।
পত্ন্যাং রাজ্ঞো দ্বিতীয়ায়ামাশবাসৌ বভূবতুঃ॥
বঙ্গবেড়ং তয়োরাশো বাসো বঙ্গং জগামচ।
বাসপুত্রো দ্বিতীয়শ্চ বরেন্দ্রক্ষিতিমাশ্রয়ৎ॥
রুদ্রস্যচ ত্রয়ঃ পুত্রাঃ জ্যেষ্ঠঃ উদ্ধারণঃ স্মৃতঃ।
উদ্ধারণস্য বল্লালঃ পুত্রস্তারাপতিস্তথা॥
রুদ্রপুত্রো দ্বিতীয়স্তু নাম্না গণপতিঃ কৃতী।
কান্দীশো দীর্ঘিকাকারঃ শক্তি ভক্তি নিয়ন্ত্রিতঃ॥
তৃতীয়ো রুদ্রজো বিষ্ণুরন্যপত্নী সমুদ্ভবঃ।
পণ্যাং গন্তুং মনশ্চক্রে সাভাস্যে বিয়াতক্ষে॥ (৩)

ষট্তে গণপতেঃ পুত্রাঃ প্রসিদ্ধা বংশকৃন্বরা।
জাতাঃ সিংহকুলে সিংহো যথা গঙ্গাসরিৎকূলে॥
জ্যেষ্ঠঃ জীবধরঃ শ্রীমান্ মণ্ডলো রাঢ়মণ্ডলে।
শ্রেষ্ঠঃ প্রভাকরঃ জ্ঞেয়ঃ করণোৎকর্ষ হেতুনা॥
নামভ্যামেতয়োঃ খণ্ডে গ্রামস্য দ্বে বভূবতুঃ।
উত্তরস্থং কনিষ্ঠস্য জ্যেষ্ঠস্য দাক্ষিণস্থিতম্॥
দ্বিতীয়স্যাং স্ত্রিয়াং সুতৌ নারদো মধুসূদনঃ।
মাধবী পুরমাশ্রিতা বিশ্রুতৌ গুণভূষিতৌ॥
কুলাংশে মধু অর্দ্ধাংশো নারদঃ শ্রেষ্ঠ ঈরিতঃ।
উদ্ভবশ্চতৃতীয়স্যাং পত্ন্যামঙ্গজয়োর্ষয়োঃ।
যয়োনাম্না সমাখ্যাতে নন্দনশ্চ বিকর্ত্তনঃ॥”

বিদ্যা-বিনয় সম্পন্ন শ্রীকরণ বংশোদ্ভূত যশস্বী পাঁচজন কায়স্থ অনাদিবর সিংহ, সোমেশ্বর ঘোষ, পুরুষোত্তম দাস, সুদর্শন মিত্র ও দেবদত্ত অযোধ্যা, মথুরা ও মায়াপুরী হইতে আগমন করেন। তাঁহারা সকলেই ক্রমিক বাৎস্য-সৌকালিন, মৌদ্গল্য বিশ্বামিত্র ও কাশ্যপগোত্রধারী ছিলেন। ইঁহাদের পাঁচজনের উপাধি ক্রমশঃ সিংহ ঘোষ দাস মিত্র ও দত্ত। সিংহ ও ঘোষ উভয়ে অযোধ্যা হইতে, দাস মথুরা হইতে এবং মিত্র ও দত্ত মায়াপুরী হইতে আগমন করেন। তাঁহারা এপ্রদেশে আসিয়া কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় কায়স্থ ও কর কায়স্থের সহিত মিলিত হন। ঐ সকল কায়স্থের বাস পূর্ব্ব হইতে এদেশে ছিল।

অনাদিবর সিংহ সিংহেশ্বর গ্রামে বাস করেন। তিনি কীর্ত্তিমান্ ও অতুলপ্রজ্ঞ ছিলেন। শিবলিঙ্গ স্থাপন ও সরোবর

অতিথির পূজা করিতেন এবং দেবসেবারত ও স্বজাতির প্রতিপালক ছিলেন। অনাদিবর সিংহের সূর্য্যধর নামে এক পুত্র জন্মে। তিনিও পিতৃমার্গ অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের পুত্র বরাহ; বরাহের দুই পুত্র মদন ও ভৈরব। সুরাপান, অশ্ববিক্রয় প্রভৃতি অবৈধ কার্য্য করা হেতু নিজ বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইলেও ভৈরব পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। কালিকাদেবীর বরপ্রাপ্ত হইয়া মদন রাণা উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। তিনি দেখিতে মদনের তুল্য ছিলেন ও জাজিগ্রামের রাজা হইয়াছিলেন। ভৈরবের পুত্র ডোমন; ডোমনের পুত্র ইমন। ইমনের সাক্ষাৎ লক্ষ্মীধরের ন্যায় লক্ষ্মীধর নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি অতিশয় গুণবান, ধীর ও সভাস্থলে বিখ্যাত ছিলেন এবং তিনি কায়স্থ সমাজ কর্ত্তৃক "করণ-গুরু" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিনপুত্র; গদাধর, ভগীরথ ও ব্যাসসিংহ। গদাধর জ্যেষ্ঠপুত্র হইলেও সম্মানে খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগীরথ বঙ্গজ শ্রেণীভুক্ত হন ও কনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠতালাভ করেন। করাতী ব্যাস সিংহ শুদ্ধ-কীর্ত্তি স্বজাতিপূজ্য ভক্তিমান্ ও কুলশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সকলপ্রকার দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন এবং তিনিই ব্যাসপুর নামক সুন্দর বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

ব্যাস সিংহের করাতিয়া আখ্যা প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তিনি বল্লালসেনের মন্ত্রী ছিলেন। কোন নীচকুলোদ্ভবা রমণীর সহিত সহবাস হেতু অপবাদে বল্লালসেন কলঙ্কিত হওয়ায় ব্যাসসিংহ বল্লালের গৃহে জলপান পর্য্যন্ত করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে রাজা তাঁহাকে ভয় দেখান যে যদি তিনি রাজবাটীতে

আসিয়া আহারাদি না করেন তবে করাত দ্বারা তাঁহার শির-শ্চেদন করা হইবে। ইহাতেও ব্যস সিংহ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়া রাজাজ্ঞা উপেক্ষা করিলে উক্ত ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া ছিলেন। এজন্ত তাঁহার পিতা করণ গুরু বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন।

ঢাকুর বা বারেন্দ্র কায়স্থ-তত্ত্বে লিখিত আছে যে,

"আছয়ে প্রবাদ শুনহে সংবাদ
উত্তর রাঢ়ী সমাজে।
শ্রীঅনাদিবর, তার বংশধর
ব্যাসসিংহ বংশ মাঝে ॥
সেহ পানাহার, নাকরে স্বীকার,
একদা বল্লাল ঠাঁই।
করাত প্রহারে, ব্যাসসিংহ শিরে
ছেদিতে বলিলা তাই ॥
সেই সে কারণে, তারে সর্ব্বজনে
করাতিয়া আখ্যা দিল।
পেয়ে তার নাম, খ্যাত সেই গ্রাম
যথা সে বাস করিল ॥"

ব্যাসের দুই পুত্র; বনমালী ও বামদেব। বামদেব গোপকন্তা পরিগ্রহ করা হেতু তিনি নিজ বসতি গ্রাম ত্যাগ করিয়া ও অগ্রজকে ধিক্কার দিয়া পতিত হন। তিনি গোপকন্তার সহিত কান্দী কল্যাণপুরে বাস করেন। কনিষ্ঠ বনমালী বন কাটিয়া

ময়ূরাক্ষী তটস্থ কান্দীতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তিনি বহুসম্মান লাভ করিয়াছিলেন ও কুলেশ্বর ছিলেন। তিনটি শিবলিঙ্গ, বিষ্ণুমূর্ত্তি ও লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠা করেন ও অনেক পুষ্করিণী খনন করেন। বনমালীর দুই পুত্র ; কেশব ও শ্রীপতি। কেশব বিবিধ সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন ও বারাণসীতে দেহত্যাগ করা হেতু পরমা গতি লাভ করেন।

কেশবের পুত্র বিখ্যাত রাজা বিনায়ক সিংহ। তিনি প্রতাপে, প্রজাপালনে, দানে, ব্রাহ্মণভক্তিতে, অতিথিশালা স্থাপন ও দীন অদীন পরিপোষণ দ্বারা দেশবিখ্যাত যশঃ লাভ করেন। তাঁহার প্রথম পুত্র গোপাল পতিরাজ, তিনি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র রাজা লক্ষ্মীধর। রাজা লক্ষ্মীধর প্রসিদ্ধ ভদ্র ও রাজকর্ম্মপটু ছিলেন তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে তিন বিচক্ষণ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, রুদ্র, দামোদর ও বিদ্যাধর। জ্যেষ্ঠ রুদ্র কান্দীতে বাস করিয়া রুদ্রদেব-সেবাপরায়ণ ছিলেন ও রুদ্রদেবের কৃপায় তিনি শীঘ্রই কৃতার্থত লাভ করেন। উদার-বুদ্ধি দামোদর সাসপাড়া গমন করেন ও রাঢ়মণ্ডলে বিখ্যাত হন। বিদ্যাধর জাত্যন্তরগত ও ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে আয ও বাস দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। আয ও বাস উভয়েই বঙ্গদেশ গমন করেন। বাসপুত্র বরেন্দ্রভূমি আশ্রয় করেন।

রুদ্রের তিন পুত্র, উদ্ধারণ, গণপতি ও বিষ্ণু। উদ্ধারণের দুই পুত্র বল্লাল ও তারাপতি। রুদ্রের পুত্র গণপতি দীর্ঘাকার পুরুষ ছিলেন ও শক্তিউপাসক ছিলেন। তৃতীয় পুত্র বিষ্ণু পুস্তা-গ্রামে গিয়া বাস করেন। গণপতির ছয় পুত্র যথা—জীবধর, প্রভাকর, নারদ, মধুসূদন, নন্দন ও বিকর্ত্তন।

এই পর্য্যন্ত ঘটককারিকার বর্ণনা। তাহার পর সরকারী কাগজপত্রে এই বংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। জীবধর বংশে হরেকৃষ্ণ সিংহ প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দীতে বাস করেন। তিনি প্রথমতঃ কুসীদজীবীর ব্যবসায় করিতেন, পরে রেশমের ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। হরেকৃষ্ণ সিংহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমন সময়ে কান্দী হইতে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর বোয়ালিয়া নামক স্থানে নিজ বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবকে অনেক টাকা নজর দিয়া ঐ গ্রাম প্রাপ্ত হন, এখনও ঐ গ্রাম কান্দী রাজবংশীয়দিগের সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত।

হরেকৃষ্ণ নিজে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ও সমুদয় পরিবারবর্গকেও বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র নারায়ণ সিংহ, গৌরাঙ্গসুন্দর ও বেহারী সিংহ। ইঁহাদের মধ্যে গৌরাঙ্গসুন্দরই কার্য্যে পটু ছিলেন ও বঙ্গাধিকারী মহাশয়দিগের অধীনে কার্য্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন ও বিস্তর মহাল তালুক ও লাখেরাজ জমী খরিদ করেন। দেবসেবা প্রভৃতিতে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তিনি দিল্লীর বাদসাহ সাহ্ আলমের নিকট হইতে কান্দীতে ৺রাধাবল্লভ ঠাকুরের মন্দির নির্ম্মাণ জন্য চিরস্থায়ী সনন্দ প্রাপ্ত হন ও মজুমদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি নবাবের এমতাজ মহলের কার্ণিসের অনুকরণে অট্টালিকা প্রস্তুত করেন ও নবাব সিরাজউদ্দৌলা এ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ কার্ণিস ভগ্ন করিতে আদেশ দেন। এখনও ঐ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। তাঁহার কোন পুত্রাদি ছিল না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেহারী

সিংহের দীনদয়াল, রাধাকান্ত, রাধাচরণ ও গঙ্গাগোবিন্দ নামে চারিপুত্র হয়। গৌরাঙ্গ রাধাকান্তকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন।

রাধাকান্তও বঙ্গাধিকারীর অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও নিজ ক্ষমতায় বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব রাধাকান্তের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—

"Radhakanta was a high Revenue officer under Aliverdi Khan and Sirajuddowla Nawabs of Bengal and when the British obtained the Dewany of the Subas Bengal, Behar and Orissa from the Emperor Sah Alam II of Delhi, he rendered great service, by placing at their disposal the many settlement and collection papers for which he was rewarded by the grant of Sayer Mahal and right of collecting "*octroi*" at Hughli."

রাধাকান্ত নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ও সিরাজ-উদ্দৌলার অধীনে একজন উচ্চপদস্থ রাজস্ব কর্ম্মচারী ছিলেন। যখন ইংরেজেরা বাদসাহ সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন সেই সময়ে বহুতর বন্দোবস্তী ও আদায়ের কাগজপত্র ইংরেজের হস্তে দিয়া তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এজন্য পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে সায়ের মাহাল দেওয়া হয় ও হুগলীতে শুল্ক আদায় করিবার স্বত্ব অর্পণ করা হয়।

রাধাকান্ত নিজামতে বেশী দিন কার্য্য করিতে পান নাই, কারণ ইংরাজদের সহিত তাঁহার চিঠিপত্র চলায় তিনি সন্দেহের পাত্র হন। সে সময়ে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার অদম্য ক্ষমতা ও

অপরিসীম প্রভুত্ব। তিনি রাধাকান্তকে সন্দেহ করিয়া প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বহুপূর্ব্বে রাজা দুর্ল্লভরাম রাধাকান্তের গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এজন্য তিনিই রাধাকান্তকে তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টার সংবাদ দেন ও রাজা দুর্ল্লভরামের উপদেশেই তিনি নদীয়ায় পলায়ন করেন। নদীয়ায় সে সময় নবাব সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হইতেছিল। রাধাকান্ত সিরাজ উদ্দৌলার সম্বন্ধে অনেক গোপনীয় সংবাদ দেন ও তাঁহার দ্বারা ইংরাজেরা পলাশীর যুদ্ধে অনেক উপকার পাইয়াছিলেন।

নবাব মীরজাফর নবাবীপদ প্রাপ্ত হইলে ক্লাইব তাঁহাকে মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা দুর্ল্লভরামের সহিত রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। রাধাকান্ত অতিশয় হিন্দু ছিলেন ও তিনি কান্দীর ঠাকুরবাটীর উন্নতি করেন। ১১৬৮ সালে তিনি অনেকগুলি গ্রাম খরিদ করেন ও ১১৭৮ সালে ঐ সমুদয় গ্রাম ও আরও চারি গ্রাম তিনি ৺রাধাবল্লভ জীর নামে অর্পণ করেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল ও কার্য্যপটুতাও বিলক্ষণ ছিল। রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১১৭৯ সালে মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বে রাধাকান্ত তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ ভ্রাতা রাধাচরণ ও গঙ্গাগোবিন্দকে ৺রাধাবল্লভজীর সেবায়েৎ নিযুক্ত করেন ও ঠাকুরের সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতে আদেশ দেন।

রাধাচরণের দুই পুত্র; রামানন্দ ও বিজয়গোবিন্দ। তিনি ১১৩৪ সাল পর্য্যন্ত বাটীর কাজকর্ম্ম চাঙ্গী হইতে তত্ত্বাবধান করিতেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহই এই বংশের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। গঙ্গাগোবিন্দের নাম কাহারও অবিদিত নাই। ভগবান্ তাঁহাকে

অপরিমিত বুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারিত না ও হয় নাই। তাঁহার সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশের রাজনীতি তাঁহার হস্তে পরিচালিত।

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে তিনজন প্রধান কর্ম্মচারী দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইতেন।

(১) নবাব

(২) রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী

(৩) রায় রায়ান বা ফৌজদারী বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী।

এই তিন কর্ম্মচারীর পদ পুরুষানুক্রমে দেওয়া হইত। রাজস্ব সেরেস্তার কার্য্য বঙ্গাধিকারীদের ছিল ও পুলিসের কার্য্য মহারাজা রাজবল্লভের ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ বঙ্গাধিকারীর অধীনে কার্য্য করিতেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার ভ্রাতা অবসর গ্রহণ করার পর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ রেজা খাঁর অধীনে কানুনগোর কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতা, কার্য্যপটুতা, বুদ্ধি ও প্রতিভা ওয়ারেন হেষ্টিংসের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলে তিনি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে দেওয়ান ও কাশিমবাজারের কান্তবাবুকে নিজবাটীর তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত করেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কিছুদিন কার্য্য করার পর ১৭৭৫ খৃঃ মে মাসে হেষ্টিংসের বিপক্ষ পক্ষ অধিক হওয়ায় পদচ্যুত হন কিন্তু কর্ণেল মনসুনের মৃত্যুতে ১৭৭৬ খৃঃ ৪ঠা নভেম্বরে পুনরায় ঐপদে নিযুক্ত হন।

গঙ্গাগোবিন্দ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, তিনি কাজকর্ম্ম পাইবার মানসে মুর্শিদাবাদ আসিয়া কান্তবাবুর পল্লীতে গঙ্গাতীরে বাসা গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। একত্রে একস্থানে বাস হেতু কান্তবাবুর সহিত গঙ্গাগোবিন্দের বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। একদিন কান্তবাবু কথা প্রসঙ্গে হেষ্টিংসের জীবনরক্ষার বিষয় উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে হেষ্টিংস্ প্রদত্ত কাগজখানি দেখাইয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ তদ্দর্শনে সহজে বুঝিয়াছিলেন যে, কান্ত বাবু যে সাহেবের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন সেই সাহেবই তখন কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল। তখন গঙ্গাগোবিন্দ প্রমুখাৎ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কান্ত বাবু কাগজ খণ্ডের উপকারিতা বুঝিয়াছিলেন ও উভয় বন্ধু পরামর্শ স্থির করিয়া কলিকাতা গমন জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যথাসময়ে বন্ধুদ্বয় কলিকাতা পঁহুছিয়া গবর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন রাজপ্রাসাদের ফটক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন। হেষ্টিংস্ অপরাহ্নে যখন বায়ুসেবনার্থ বাহির হইতেন তখন প্রত্যহ বন্ধুদ্বয়কে দাঁড়াইয়া থাকিতে ও অভিবাদন করিতে দেখিয়া ৫। ৭ দিন পর তাঁহাদিগকে ডাকিয়া নিত্য উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। গঙ্গাগোবিন্দ কান্ত বাবুর নিকট হইতে কাগজখণ্ড লইয়া গবর্ণরের হস্তে দেন। তদ্দর্শনে সকল কথা হেষ্টিংসের মনে পড়ে ও তাঁহাদিগকে পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ করিতে আদেশ দেন। পরদিন হেষ্টিংস্ উভয়কে গবর্ণমেণ্টের অধীনে যোগ্যতানুরূপ পদে নিযুক্ত করেন। গঙ্গাগোবিন্দ গবর্ণর জেনারলের দপ্তরে সামান্য মহুরীর পদ প্রাপ্ত হন ও কান্ত বাবু লাট সাহেবের ও তৎপত্নীর নিজ ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ক্রয় করা ও ভৃত্যাদির কার্য্য তত্বাবধান

করার জন্য সরকারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দশ-শালা বন্দোবস্ত ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল।

১১৮৪ সালে দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার দত্তকপুত্র রাধানাথ ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কান্তনাথের মধ্যে উত্তরাধিকারী স্বত্ব লইয়া বিবাদ হয়। হেষ্টিংস গঙ্গা-গোবিন্দের পরামর্শে রাধানাথকে জমীদারী দেন ও রাজার নাবালক অবস্থায় তিনি জমীদারী পর্য্যালোচনা করেন ও অভি-ভাবক ছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দের সেসময়ে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও ভয় করিতেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে হেষ্টিংসের পর দ্বিতীয় ব্যক্তি জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন "দরবার অসাধ্য পুত্র অবাধ্য কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ"। এডমণ্ড বার্ক গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে যথাশক্তি গালি দিতে ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু যেসময়ে হেষ্টিংস বঙ্গদেশে ছিলেন সেসময়ে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মত লোকের সহায়েই ইংরেজেরা ভারতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস স্বীয় শক্তি সঞ্চালনের কেন্দ্রস্থান বঙ্গদেশে গঙ্গাগোবিন্দের মত লোকের সহায় না পাইলে এত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বিরাট মাতৃশ্রাদ্ধের কথা বোধহয় সকলেই শুনিয়াছেন। উক্ত শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাশী কাঞ্চী মিথিলা নবদ্বীপ হইতে পণ্ডিত মণ্ডলীর শুভাগমন হইয়াছিল। নবদ্বীপ, নাটোর বর্দ্ধমান ও দিনাজপুরের রাজা ও বহুতর জমীদার শ্রাদ্ধোপলক্ষে কান্দী আসিয়াছিলেন। বহুতর খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন হইয়াছিল এবং দুগ্ধ ঘৃত, তৈল, অন্ন ও দাইল রাখিবার জন্য

পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগকে অপরিমিত সিধা-দেওয়া হইত। কথিত আছে যে পুরীধাম হইতে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ আনাইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অসুস্থ থাকায় তিনি তাঁহার পুত্র শিবচন্দ্রকে শ্রাদ্ধ সভায় প্রেরণ করেন। শিবচন্দ্র প্রথমতঃ আসিতে স্বীকার পান নাই কিন্তু পিতার আদেশে আসিতে স্বীকৃত হন। শিবচন্দ্র দেওয়ানের প্রদত্ত সিধা পাইয়া ভিক্ষুকদিগকে সমুদয় সিধা দান করেন। দ্বিতীয়বার সেই পরিমাণ সিধা দেওয়া হয়, তাহাও ঐরূপ ভাবে শিবচন্দ্র দান করেন। শিবচন্দ্রের নিকট তৃতীয়বার সিধা প্রেরিত হইলে তিনি বলেন যে "দেওয়ানজী, এ যে দক্ষযজ্ঞের আয়োজন"। শিবচন্দ্র দেওয়ানজীর উত্তরে—তাঁহার দাম্ভিকতাপূর্ণ কথাতে প্রথমতঃ অসন্তুষ্ট হন কিন্তু, দেওয়ানজীর উত্তরের শেষভাগে সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। দেওয়ানজী উত্তর দেন "দক্ষযজ্ঞের চেয়েও বেশী—কারণ তাহাতে শিব যান নাই, ইহাতে শিবের আগমন হইয়াছে"। গঙ্গাগোবিন্দ শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিজ ভূস্বামী জেমুয়ার রাজাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য রাজা মহারাজার ন্যায় আসনের বন্দোবস্ত না করিয়া দানোৎসর্গের সময় নিজের দোশালা খুলিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বসিতে দেন। এইরূপ বিরাট শ্রাদ্ধ কেহ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রবাদ আছে। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিশলক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ আরও দুইটী মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন,—তাঁহার পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র বা লালাবাবুর অন্নপ্রাশন, এবং পুরাণের কথা প্রদান। পৌত্রের অন্নপ্রাশনে তিনি স্বর্ণ-

পাত্রে খোদিত লিপি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় সোণামুখীর প্রসিদ্ধ পুরাণ-কথক গদাধর শিরোমণি পুরাণ-কথায় ব্রতী ছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। তিনি নবদ্বীপের সন্নিকটে রামচন্দ্রপুরে গোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র ও মদনমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবার জন্য অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া যান। গঙ্গাগোবিন্দ ৺ রাধাবল্লভের বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সেবার সুবন্দোবস্ত করেন। রাধাবল্লভের নিত্য ভোগ অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে যেরূপ সেবার বন্দোবস্ত আছে, মুর্শিদাবাদের কোনও দেবালয়ে সেরূপ বন্দোবস্ত নাই। রাধাবল্লভের সেবার সম্বন্ধে বাবু ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন:—

"Of all the shrines, the one at Kandi is maintained with the greatest liberality. The God here seems to live in the style of the great Mogul. His musnud and pillows are of the best velvet and damask richly embroidered. Before him are placed gold and silver salvers, cups, tumblers, *pandans*, and jugs all of various size and pattern. He is fed every morning with fifty kinds of curries, and ten kinds of pudding. His break-fast over, gold hookas are brought to him to smoke the most aromatic tobacco. He then retires to his noonday *siesta*. In the the afternoan he tiffs and lunches, and at night sups the choicest and richest viands with new names in the vocabulary of Hindoo confectionery. The daily expense at this shrine is

said to be 500 Rupees, inclusive of alms and charity to the poor."

(Travels of a Hindoo, vol. I p. 66.)

রাধাবল্লভের রাসযাত্রাও বহু সমারোহে সম্পন্ন হইত ও কান্দীতে উৎসব দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হইত।

গঙ্গাগোবিন্দ যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তৎসমুদয় সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া তিনি নিজ নামকে স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ পণ্ডিতের বড় সম্মান করিতেন ও বিদ্যার আদর করিতেন। এজন্য তিনি যথেষ্ট অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রাণকৃষ্ণ সিংহ ১১৬১ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য রাধাকান্ত অপুত্রক হওয়ায় তিনি প্রাণকৃষ্ণকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। প্রাণকৃষ্ণ পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত উভয়ের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ধনী হইয়া উঠেন। প্রাণকৃষ্ণ কলিকাতায় পিতার নিকট কার্য্য শিক্ষা করেন ও পরে আজিমাবাদ বন্দোবস্তের সময় তিনি একজন প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তিনি বীরভূম জেলায় লাট শ্রীহাটী ও লাট জোবীর এবং বাগোয়ান পরগণার ৸০ আনা অংশ ও নগদী পরগণার ষোল আনা অংশ বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিলেন। প্রাণকৃষ্ণের সময়ে

তাঁহাদের উন্নতি চরম সীমায় উপস্থিত হয়। জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার ন্যায় প্রাণকৃষ্ণ দেবসেবা, ব্রাহ্মণ সেবা ও অতিথি সেবা পরায়ণ ছিলেন। তিনিও অনেক স্থানে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেব সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রাণকৃষ্ণের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বা লালা বাবুর স্বার্থত্যাগ ও অক্ষয়-কীর্ত্তি তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সমগ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও বঙ্গদেশে তিনি ধর্ম্মানুরাগ জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র বাল্যকালে পড়াশুনায় মনোযোগী ছিলেন। নিজের অধ্যবসায়ে ও চেষ্টায় তিনি আরবী, পার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কঠিন শ্লোক গুলি সহজে বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। বদান্যতা তাঁহার চরিত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। বাল্যকালেই তাঁহার দানশীলতার চিহ্ন প্রকাশ পায় এবং দানশীলতাই পিতার সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের কারণ হয়। যখন তাঁহার বয়স কেবল ১৭ বৎসর মাত্র, সে সময়ে একজন দুঃখী দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার বিবাহযোগ্যা কন্যার বিবাহে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ১০০০৲ এক হাজার টাকা সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি খাজাঞ্চীকে প্রার্থিত এক হাজার টাকা দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে আদেশ করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে তিনি ঐ কথা প্রাণকৃষ্ণের গোচরে আনেন। পিতা পুত্রের এই কার্য্য ও ব্যবহারে মনে মনে অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু পুত্রের অনুরোধ রক্ষা করিয়া খাজাঞ্চীকে ঐ টাকা দিতে বলেন ও কৃষ্ণচন্দ্রকে এই কথা

জানাইতে বলেন যে, যদি ভবিষ্যতে কৃষ্ণচন্দ্র দান করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে দান করিবেন। একথা খাজাঞ্চী কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রকাশ করিলে কৃষ্ণচন্দ্র পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিজ ক্ষমতায় অর্থ উপার্জ্জন করিবার সামর্থ্য দেখাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পড়াশুনা ত্যাগ করতঃ বাটী হইতে বাহির হন ও বর্দ্ধমানে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্‌টরের সেরেস্তাদারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরেজ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা অধিকৃত হয় তখন তিনি উড়িষ্যা বন্দোবস্তের কার্য্যে দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালীন তিনি রাহন, সায়ার ও চাব্বিসাকুদ প্রভৃতি পরগণা খরিদ করেন। বর্দ্ধমানে থাকা কালীন তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত লাট বিশালাক্ষীপুর অর্জ্জন করেন। পিতা পুত্রে তাহার পর সাক্ষাৎ হয় নাই কিন্তু প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কলিকাতায় থাকিতেন ও সম্পত্তি দেখাশুনা করিতেন। শোভাবাজারের রাজা ও যোড়াশাঁকোর সিংহ ভিন্ন আর কোন বড় ঘরের সহিত তিনি মিশিতেন না। শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণের মাতা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

তিনি মধ্যজীবনে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য বৃন্দাবন গমন করেন। তাঁহার সংসার পরিত্যাগ সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। একটী গল্প এখানে উল্লেখ করিতেছি। একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার একজন পরিচারিকা বলিয়া উঠে, "সন্ধ্যা হইল, বাসনায় আগুণ দিতে হইবে।"

লালা বাবু বুঝিলেন যে, জীবনেরও সন্ধ্যা উপস্থিত, অতএব বাসনা জ্বালাইবার সময় হইয়াছে। অতঃপর তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বৃন্দাবনে তাঁহার দান ও অসাধারণ ভক্তি প্রবণতায় তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীনারায়ণের শিক্ষার ও তাঁহার বাটীর সুবন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতা চোরবাগানের নীলমণি বসুকে সমুদয় জমীদারী পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার অর্পণ করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন। তিনি সঙ্গে ২৫ লক্ষ টাকা লইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হন ও তথায় ভরতপুরের মহারাজ কর্তৃক নির্ম্মিত এক অট্টালিকায় বাসস্থান স্থির করেন। তাঁহার দানের কথা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে দস্যুরা তাঁহার বাটী লুণ্ঠন করিয়া প্রায় ৩ লক্ষ টাকা লইয়া যায়। দেবসেবা ও অতিথিসেবা তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ও বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া উক্ত বিগ্রহের একটী সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। রাজপুতানার একজন রাজা তাঁহার সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাকে প্রস্তর ও মার্ব্বেল বিনা খরচে দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ প্রতিনিয়ত লালাবাবুর জয় কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের জন্য তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পরগণা অনুপসহর ও মথুরার কিয়দংশ খরিদ করেন। মথুরা জেলায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃষভানুপুর (বর্ষান), নন্দগ্রাম ও জাবট গ্রাম খরিদ করেন। তিনি বহু টাকা ব্যয় করিয়া রাধাকুণ্ডের চারিধার চুণার প্রস্তর দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। লালাবাবু শেষ জীবন বৃন্দাবনে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

লালাবাবুকে একবার বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। রাজপুতানার যে রাজা তাঁহাকে বিনামূল্যে মর্ম্মর প্রস্তর প্রদান করেন, ঐ রাজার সহিত সেই সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধির প্রস্তাব হইতেছিল। রাজা সম্মতি প্রদান করিতে ইতস্ততঃ ও বিলম্ব করায় তাঁহার এরূপ মনোভাবের কারণ অনুসন্ধান করা হয়। সেই সময়ে সার চার্লস মেট্‌কাফ্‌ দিল্লীতে রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি লালাবাবুর পরামর্শে এইরূপ হইতেছে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে ধৃত করিয়া লইয়া যান। জনসাধারণ এই ব্যাপারে অবাক্‌ হইয়া পড়িল। প্রায় দশহাজার লোক তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হয়। সার চার্লস মেট্‌কাফ্‌ এইরূপ জনতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হন ও তাঁহার লোক-প্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করেন। শান্তিপুর নিবাসী মেট্‌কাফের ফার্সিনবীস মহুরী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়ের নিকট হইতে ও অন্যান্য লোকের নিকট হইতে লালাবাবুর সংসার ত্যাগের কথা শুনিয়া ও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় মেট্‌কাফ্‌ সাহেব তাঁহাকে নিজ সমক্ষে ডাকাইয়া আনেন। লালাবাবু এরূপ তেজস্বিতার সহিত নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করেন যে সাহেব মুগ্ধ হন। মহারাণার দেওয়ানী করার কথাতে তিনি বলেন “আমি বহুদিন মানবের দাসত্ব করিয়া আসিতেছি, এখন ভগবানের দাসত্ব কার্য্যেই আমার মন প্রাণ অনুরক্ত”। পরদিন সার চার্লস মেট্‌কাফ্‌ তাঁহাকে দিল্লীর বাদসাহের একজন বিশ্বাসী ও উপকারী ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেন। বাদসাহ তাঁহাকে মহারাজা খ্যাতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে চাহেন কিন্তু লালাবাবু স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তেজস্বিতার সহিত ঐ খ্যাতি গ্রহণ করিতে

আসেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে মথুরা জেলার আপামর সাধারণের আহ্লাদের সীমা ছিল না।

মথুরা জেলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বৈষ্ণবেরা গোবর্দ্ধনকে অধিকতর ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। লালাবাবু কৃষ্ণদাস বাবাজীর নাম ইতি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী একজন ভক্তিমান্ বৈষ্ণব ছিলেন। গোবর্দ্ধনে সে সময়ে যে সকল যোগী বাস করিতেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস বাবাজীকে লালাবাবু গুরু নির্ব্বাচন করেন। লালাবাবু প্রকৃতই যোগী হইয়াছিলেন। শুনা যায় যে তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করার পর কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের সহিত তিনি বাক্যালাপ করেন নাই।

প্রবাদ আছে যে সিন্ধিয়ার সেনাপতি পরেকজী লালাবাবুর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। লালাবাবু সেনাপতিকে বলিয়া পাঠান যে যদি তিনি সন্ন্যাসীর বেশে আসেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিবেন নচেৎ সাক্ষাৎ হইবে না। পরেকজী কায কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু লালাবাবুর এইরূপ কথায় তিনি নিরস্ত হন। এইরূপে লালাবাবু গোয়া-লিয়রের মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। মহারাণী সাক্ষাৎ করিবার জন্য অতিশয় অনুরোধ করেন। লালাবাবু নিরুপায় ভাবিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া যাইবার সময় তাঁহার অশ্বের পদাঘাতে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং ঐ আঘাতেই তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হয়। মহারাণী যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহার কর্তৃক এই দুর্ঘটনার

কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার লালাবাবু নাম রাখিয়াছিলেন এবং ঐ নামেই তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিখ্যাত ও সমগ্র কায়স্থমণ্ডলী কর্ত্তৃক সম্মানিত। লালাবাবুর সংসার-বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম-প্রাণতার পরিচয় কেবল বাঙ্গালায় নহে, বৃন্দাবন মথুরায় সর্ব্বত্রে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মহাতীর্থ ভাবিয়া বহু দূর দেশ হইতে বৈষ্ণবগণ লালাবাবুর কুঞ্জ দেখিতে গিয়া থাকেন।

প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবু বিনয়ের অবতার ছিলেন। বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের অপূর্ব্ব জীবনী ভক্তমাল গ্রন্থের অনুবাদক উপরোক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকট দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে লালাবাবুর পূর্ব্বাবস্থা, তাঁহার বৈরাগ্য, দয়া ও বিনয়াদি গুণগ্রাম কৃষ্ণদাস বাবাজীর কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনিও লালাবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। একদিবস লালাবাবু বাবাজীর আশ্রমে গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করেন। এইবার গুরুশিষ্যের পরীক্ষা। উভয়েই উভয়ের বিষয় একপ্রকার অবগত আছেন অথচ এই প্রথম আলাপ। কৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুর যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়া অতি দীন ও করুণ বচনে কহিলেন, “বাবা, তোমার দীক্ষা-গ্রহণে এখন কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, আরও কিছুদিন বিলম্ব কর।” লালাবাবু বাবাজীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ ও বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। তিনি আপনার ত্রুটী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে ভাবিলেন, “আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছি। নিজের ঠাকুর বাটীতে একমুষ্টি প্রসাদ ভোজন করিয়া অষ্টপ্রহর হরিনাম করি। বাবাজী কহিলেন, আমার এখনও দীক্ষার বিলম্ব আছে, আমার বড়ই

দুর্ভাগ্য।” অনন্তর নিবিষ্টমনে চিন্তা ও চরিত্রানুশীলন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন “বুঝিয়াছি, যথার্থই আমার দীক্ষা-গ্রহণে বিলম্ব আছে। ভগবদ্‌ভক্তির ঘোর প্রতিবন্ধক, হৃদয়ের প্রধান মালিন্য অহঙ্কার এখনও আমার সমুদয় হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে। আমার ঠাকুরবাড়ী, আমার ব্যয়-সম্পন্ন প্রসাদ ভোজন করি, ইত্যাদি—‘আমার’ ‘আমার’ এই জ্ঞান তো যায় নাই, আমাকে ধিক্।” লালাবাবু সেই মুহূর্ত্তে নিজের ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ ভোজন ত্যাগ করিয়া মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করতঃ কুঞ্জে কুঞ্জে এক এক মুষ্টি ভিক্ষা লইয়া দিনান্তে তাহাই ভোজন করিতে লাগিলেন। হৃদয় হইতে যখন অহংজ্ঞান একবারে চলিয়া গেল, ‘আমার বিষয়, ‘আমার ঠাকুর বাড়ী,’ ইত্যাদি মনোভাব যখন আর উদয় হইলনা দেখিলেন, তখন একদিবস ধীরে ধীরে বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে দীন-নয়ন অর্পণ করিয়া অধোবদনে আপনার অভিপ্রায় পুনর্ব্বার জ্ঞাত করিলেন। এবার ভাবিয়াছিলেন বাবাজী তাঁহাকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। বাবাজী তাঁহার অধিক সমাদর করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা মধুরভাবে মৃদুবচনে কহিলেন, ‘বাবা তোমার দীক্ষা-গ্রহণে এখনও একটু বিলম্ব আছে।’ লালাবাবু স্তম্ভিত হইলেন। চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় বাবাজীর কুটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কি দোষে মন্ত্র-গ্রহণে এখনও তিনি অযোগ্য কোনরূপে স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। একটি একটি করিয়া স্বীয় অপরাধ অন্বেষণ করিতে করিতে ভাবিলেন, “আমি স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের

তরুতল আশ্রয় করিয়াছি ; মাধুকরী-ব্রত ধারণ করিয়া দিনপাত করিতেছি, হরিপাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়া অষ্টপ্রহর ভগবানের নাম লইতেছি বটে কিন্তু আমার মনের মলিনতা এখনও দূর হয় নাই। কৈ, শেঠ বাবুদের কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে তো যাইতে পারি নাই। এখনও ত শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ-বুদ্ধি বেশ প্রবল রহিয়াছে, তবে আমার মন বিশুদ্ধ হইল কৈ? শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, ভেদজ্ঞান এত প্রবল থাকিতে অহঙ্কার বুদ্ধি কি প্রকারে যাইবে? এই গুণে আমি বাবাজীর কৃপাপ্রার্থী হইতে গিয়াছিলাম! ধন্য বাবা কৃষ্ণদাস, ধন্য তোমার মহিমা! তোমার মহিমার অন্ত নাই, তুমিই আমাকে তোমার দাসের যোগ্য করিতেছ।"

যে শেঠ বাবুদের নাম ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইল তাঁহারা জয়পুরের একজন মহাধনী জমীদার এবং মহাভক্ত ; বৃন্দাবনে তাঁহাদের প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী ও সেবা আছে। ইঁহাদের ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই। মথুরা এবং সন্নিহিত স্থানে কয়েক-খানি জমীদারী আছে ; তাহা হইতে লক্ষাধিক মুদ্রা আয় হয়। এই জমীদারী লইয়া শেঠ বাবুদের সহিত তাঁহার বহুকাল হইতে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল। পরস্পর পরস্পরের মুখ দর্শন করিতেন না। এই সূত্রে এরূপ ঘোর শত্রুতা জন্মে যে উভয়ের জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হইয়াছিল।

লালাবাবু সকল কুঞ্জে ভিক্ষা করিতে যাইতেন, কিন্তু শেঠ বাবুদের বাড়ীতে যাইতে তাঁহার পা উঠিত না, মনে হইলে মাথা কাটা যাইত। এখন তাঁহাদের বাড়ী গিয়া ভিক্ষা করিতে হইবে—কি ভয়ানক কথা! লালাবাবু যখনই তাঁহার ক্রী

লক্ষ্য করিলেন তখনই তাঁহার মান, অভিমান, শত্রুতা অহঙ্কার পলায়ন করিল। তিনি পরদিন মধ্যাহ্নকালে যমুনায় স্নান করিয়া অতি হীন বেশে শেঠ বাবুদের কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতার বাঙ্গালী রাজাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারিগণ কাঁদিয়া ফেলিল। পাছে প্রভুগণ বিরক্ত হন এই ভয়ে তাহারা কিছু বলিতে পারিল না। বিনা-অনুমতিতে ভিক্ষাও দিতে পারিতেছিল না। দৈবক্রমে শেঠ বাবুদিগের কর্ত্তা ঠাকুর বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। জনৈক ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। তিনি ত্বরিতপদে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন সত্য সত্যই লালাবাবু উপস্থিত! তাঁহার হীনবেশ এবং বৈরাগ্য দেখিয়া লালাবাবুর প্রতি যে শত্রু ভাব ছিল তাহা এককালে বিদূরিত হইল। তাঁহার মুখে মাধুকরী ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিতেই তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি লালাবাবুর চরণে পতিত হইলেন। লালাবাবু শেঠজীকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয়েই প্রেমাশ্রুতে ভাসমান হইলেন। শেঠজী তাঁহাকে প্রসাদ ভোজন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু লালাবাবু তাঁহার মাধুকরীব্রত পণ্ড করিতে কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না এবং অতীব বিনীত বচনে মুষ্টি ভিক্ষাই প্রার্থনা করিলেন।

শেঠজী অগত্যা তাঁহাকে মাধুকরী দিতে আদেশ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্যাকুল চিত্তে প্রস্থান করিলেন। লালাবাবুর এই দৈন্য এবং বিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তিনি ঘোর শত্রুকে পরম মিত্র করিয়া ভিক্ষা লইয়া যেমন ঠাকুর বাড়ীর বাহিরে আসিলেন, অমনি দেখিলেন সম্মুখে কৃষ্ণদাস বাবাজী! লালাবাবু

মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। বাবাজী পরম যত্নে উঠাইয়া লালাবাবুকে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নেহপূর্ণ বচনে কহিলেন, "বাবা, তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত।"

লালাবাবুর আশ্চর্য্য বৈরাগ্য, অসাধারণ বিনয় ও দৈন্য এবং অসীম দানশীলতা তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া দীনহীনের ন্যায় পরমার্থ চিন্তায় দিন যাপন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত দীনদুঃখী অনাথগণকে অকাতরে অন্ন বস্ত্র দান করিয়াছেন, বৃন্দাবনে অন্নসত্র বসাইয়াছেন। সংসারের ধন-সম্পদ পরোপকার-ব্রতে নিয়োগ করিয়া আপনাকে ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপ মহাপুরুষ কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন! স্ত্রীপুত্র পরিবার পরিবৃত হইয়া ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, নিজ ক্ষমতায় সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া যখন অতুল সম্পদের অধিকারী, তখন সেই ভোগের সময় তিনি সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, সংসারের মায়া মমতা কাটাইয়া স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বৃন্দাবন গমন করেন। লালাবাবুর কীর্ত্তিরগুণে এখনও তাঁহার বংশাবলী সমগ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পরিচিত ও সমাদৃত।

লালাবাবুর মৃত্যুর সময় তাঁহার পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহ অত্যন্ত অল্প-বয়স্ক ছিলেন। তাঁহার মাতা কাত্যায়নী তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হন ও তিনিই সমুদয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতেন। রেভিনিউ বোর্ড এই বিপুল সম্পত্তি একজন স্ত্রীলোকের হস্তে থাকা সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া বাবু ভগবানচন্দ্র বসুকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। রাণী কাত্যায়নীও অনেক সৎকার্য্য

করিয়া গিয়াছেন। পরোপকারের জন্য তাঁহার ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কাশীপুরের গোপালজীর ঠাকুর বাটী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। রাণী কাত্যায়নী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বেলুড়ের বাটীতে এক অন্নমেরু ব্রত স্থাপন করেন ও তুলাদান কার্য্য সম্পন্ন করেন। তুলাদানে নিজ ওজনের পরিমাণ স্বর্ণ ব্রাহ্মণকে দান করেন। শ্রীনারায়ণ অতিশয় স্থূলকায় ব্যক্তি ছিলেন ও নিজে কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না। তিনি গীত বাদ্যে পটু ছিলেন। অনেক মূল্যবান সম্পত্তি তাঁহার সময়ে ক্রয় করা হয়। শ্রীনারায়ণ মৃত্যুকালে তাঁহার দুইপত্নী তারাসুন্দরী ও করুণাময়ীকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া যান। জ্যেষ্ঠাপত্নী প্রতাপচন্দ্র ও কনিষ্ঠা ঈশ্বরচন্দ্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় বদান্য ও মহানুভব ব্যক্তিছিলেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজে ৫০ হাজার টাকা দান করেন এবং হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ে ২৫০০০৲ টাকা দান করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কান্দী স্কুল স্থাপন করেন। প্রতাপচন্দ্র অনেক সৎকার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

ঈশ্বরচন্দ্রের গানবাজনায় অনুরাগ ছিল। তাঁহারই যত্নে বেলগাছিয়ার বাগানে কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত লোক মিলিত হইয়া মাইকেল মধুসূদনের শর্ম্মিষ্ঠা নাটক অভিনয় করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৩৯ বৎসর বয়সে প্রতাপচন্দ্র তাঁহার পত্নী রাণী পদ্মমুখী, ও চারিপুত্র গিরীশচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্রকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গবর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপে

সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমার ইন্দ্রচন্দ্র ও এক কন্যা কৃষ্ণকামিনীকে রাখিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর পাইকপাড়া ষ্টেট ১৮৬৭ খৃঃঅব্দ হইতে ১৮৭৯ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্‌এর তত্ত্বাবধানে ছিল। হার্ভি সাহেব ম্যানেজার ছিলেন। কুমার গিরীশচন্দ্র বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তিনি ২৯ বৎসর বয়সে ১৮৭৭ সালে পরলোক গমন করেন। কান্দী দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিনি ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দান করিয়া যান।

রাজা পূর্ণচন্দ্র ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজা বাহাদুর খ্যাতি লাভ করেন।

কুমার ইন্দ্রচন্দ্র অল্প বয়সে ১৮৯৪ সালে ১৪ই মে তারিখে পরলোক গমন করেন। কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র কুমার ইন্দ্রচন্দ্রের দত্তক পুত্র। কুমার ইন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সম্পত্তির একচতুর্থাংশ তাঁহার কন্যা সরস্বতীকে দিয়া যান। মুরশিদাবাদ পাঁচথুপীর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিকের সহিত সরস্বতীর বিবাহ হয়। সরস্বতী একপুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক মহাশয় তাঁহার পত্নীর স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে নিজগ্রাম পাঁচথুপীতে এক দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী টোল স্থাপন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। কুমার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহ ও অন্যান্য কায়স্থ মহোদয়গণ মিলিয়া উত্তর-রাঢ়ীয়-কায়স্থ-হিতকরী সভা স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সভার শিক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক বহুতর দরিদ্র বালকের শিক্ষার জন্য বৎসর বৎসর বহু টাকা দেওয়া হয়। কুমার অরুণচন্দ্র

একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, তিনিও শিক্ষার জন্য বাৎসরিক ১২০০৲ টাকা সাহায্য করিয়া সমগ্র কায়স্থ জাতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নানা দেশ-হিতকর কার্য্যে যোগ দিয়া থাকেন।

কুমার গিরীশচন্দ্রের দত্তকপুত্র শ্রীশচন্দ্র অল্পবয়সে পরলোক গমন করেন তাঁহার পুত্র কুমার শ্রীমান্ মণীন্দ্রচন্দ্র বর্ত্তমান।

রাজা পূর্ণচন্দ্রের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্রও অপুত্রক অবস্থায় অল্পবয়সে পরলোকগমন করেন।

কুমার শরচ্চন্দ্র ও তাঁহার পুত্র কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্র বর্ত্তমান।

কান্দীর রাজাগণ কলিকাতায় ও পাইকপাড়ায় বাস করেন, মধ্যে মধ্যে কান্দী আসিয়া থাকেন। এই রাজবংশ পূর্ব্বপুরুষ-গণের ন্যায় দেবসেবা ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবা ও সাধারণের উপকার করিয়া দীর্ঘজীবি হউন ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

সমাপ্ত।

অনাদিবর সিংহ

- অনাদিবর সিংহ
  - সূর্য্যধর
    - বিশ্বরূপ
      - বরাহ
        - ভৈরব
          - ডোমন (ভৈরব)
            - এমন্
              - লক্ষ্মীধর (করণ গুরু)
                - গদাধর
                - ভগীরথ
                - ব্যাসদেব (করাতিয়া)
                  - বামদেব
                  - বনমালী
                    - শ্রীপতি (কেশব)
                      - রাজা বিনায়ক
                        - গোপাল (পতিরাজ)
                        - লক্ষ্মীধর
        - রাণা মদন

- লক্ষ্মীধর
  - রুদ্র
    - উদ্ধারণ
      - বনমালী
      - তারাপতি
    - গণপতি
      - জীবধর
        - লোহাগড়
          - রামচন্দ্র
            - উদয়
              - গৌরীবর
                - রঘুনাথ
                - কাশীনাথ
                - শ্রীকৃষ্ণ
                - বিষ্ণুদাস
      - প্রভাকর
      - নারদ
      - মধুসূদন
      - নন্দন
      - বিকর্ত্তন
    - বিষ্ণু
  - দামোদর
  - বিদ্যাধর
  - আষ
  - বাস

বিষ্ণুদাস

- হরিবংশ
- মধুসূদন
- রত্নেশ্বর
- কুশল
- পরশুরাম
- হরেকৃষ্ণ ১০৭৫-১১৩২
  - নারায়ণ
  - গৌরাঙ্গ
    - দীনদয়াল ১১২৯-১১৬২
    - রাধাকান্ত ১১৩৫-১১৭৯
    - রাধাচরণ ১১৪৩-১১৮৪
      - রামানন্দ
      - বিজয়গোবিন্দ
        - গোপীমোহন
        - কৃষ্ণমোহন
        - রামমোহন
          - গৌরগোপাল
            - শরচ্চন্দ্র
            - জগদীশচন্দ্র
          - নিতাইসুন্দর
            - হেমচন্দ্র
            - নরেশচন্দ্র
        - লাড়লীমোহন
    - গঙ্গাগোবিন্দ ১১৪৫-১২০৬
      - প্রাণকৃষ্ণ ১১৬২-১২১৫
        - কৃষ্ণচন্দ্র ১১৮২-১২২৮
          - শ্রীনারায়ণ ১২১৫-১২৪৩
  - বেহারী
- জগন্নাথ

শ্রীনারায়ণ

- প্রতাপচন্দ্র ১২৩৪-১২৭৩
  - গিরীশচন্দ্র ১২৫৫-১২৮৪
    - শ্রীশচন্দ্র
      - মণীন্দ্রচন্দ্র ১৩০৫ সালে জন্ম
  - পূর্ণচন্দ্র ১২৫৯-১২৯৭
    - সতীশচন্দ্র
    - শ্রীশচন্দ্র দত্তক ১২৮৭ সালে জন্ম
  - কান্তিচন্দ্র ১২৬২-১২
  - শরচ্চন্দ্র ১২৬৭ সালে জন্ম
    - বীরেন্দ্রচন্দ্র ১২৮৮ সালে জন্ম
    - জিতেন্দ্রচন্দ্র (মৃত) ১২৯৩ সালে জন্ম
- ঈশ্বরচন্দ্র ১২৩৮-১২৬৭
  - ইন্দ্রচন্দ্র
    - অরুণচন্দ্র (দত্তক)

রামমোহন রায়ের জীবনী

ও

তদীয় শিক্ষা।

আমার অদ্যকার বক্তব্য বিষয়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চরিত্রে আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা অনুকরণীয় নহে, প্রতিভা কখন অনুকরণ করা যায় না; কিন্তু তাঁহার জ্ঞানানুরাগ, তাঁহার হৃদয়, তাঁহার প্রেম, তাঁহার জীবের সেবা, তাঁহার ধর্ম্মভাব ও ভগবদ্ভক্তি, নিশ্চয়ই অনুকরণীয়। মহাপুরুষদিগের প্রতিভা চিরদিনই অননুকরণীয়। কিন্তু তাঁহারা জগতে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যান, তাহা চিরদিনই অনুকরণীয়।

তাঁহার হৃদয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। রামমোহন রায়ের হৃদয় কোমল, প্রশস্ত ও গভীর ছিল। তাঁহার শিষ্যদের প্রতি অতি মধুর ব্যবহার করিতেন। শিষ্যগণকে এবং প্রায় সকল লোককে প্রেমের সহিত 'বেরাদার' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কোন ব্যক্তি, কোন প্রীতিকর কার্য্য করিলে, অনেক সময়, তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিতেন। কোন ব্যক্তি কোন হৃদয়গ্রাহী মধুর সঙ্গীত শুনাইলে, তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। তাঁহার হৃদয় সম্বন্ধে প্রথমে কয়েকটী ছোট ছোট গল্প বলিব।

রামমোহন রায়ের সঙ্গীতপুস্তকের সঙ্গীত রচয়িতাদিগের মধ্যে, নীলমণি ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। যে সময়ে রামমোহন রায়ের

by
Nagendranātha Caṭṭopādhyāya.

উপদেশে নীলমণি ঘোষের চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, সেই সময়ের ভাবপ্রকাশক একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া তিনি রামমোহন রায়কে শুনাইলেন। রামমোহন রায় উহা শুনিয়া মোহিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন ; এবং সঙ্গীতটিরও অনেক প্রশংসা করিলেন। সে সঙ্গীতটি এই;—

কে জানে তোমায় তারা,
তুমি সাকারা কি নিরাকারা ?
বাক্যেতে কহিতে নারি,
বর্ণেতে বর্ণিতে হারি,
ন ষণ্ড, ন পুমান্ নারী,
ব্যোম আদি ধরা।
হিতার্থে উপাধি দিয়ে,
কোন মতে নাম লয়ে,
হই যেন সারা।

কোন শিষ্য তাঁহাকে কোন বিদ্রূপ করিলে, তিনি লেশ মাত্র বিরক্ত হইতেন না। রামমোহন রায়ের বাব্‌রি চুল ছিল ; চুল গুলির প্রতি অতিশয় যত্ন করিতেন। প্রতিদিন স্নানের পর, দর্পণের সম্মুখে, কেশ-বিন্যাসে অনেক সময় অতীত হইত। এক দিবস তারাচাদ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন, "মহাশয় ?

"কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে,"

এ সঙ্গীতটি কি কেবল অন্যের জন্যই রচনা করিয়াছিলেন ? রাম-মোহন রায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "বেরাদার ! ঠিক বলিয়াছ, ঠিক্ বলিয়াছ।"

মহাপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই বালক বালিকাদিগকে বড় ভাল-বাসিতেন। ক্ষুদ্র শিশুদিগের বিষয়ে যীশুর মহাবাক্য কে না জানেন.

"ক্ষুদ্র শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও। নিষেধ করিও না। যে হেতু এইরূপ লোকের জন্যই স্বর্গরাজ্য।" রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে আপনারা পাঠ করিয়াছেন, যে, তিনি বালকবালিকাদিগকে লইয়া গৃহপ্রাঙ্গণে একটি দোল্‌নায় তাহাদিগকে দোলাইতেন, এবং নিজেও দুলিতেন। কিয়ৎক্ষণ বালকদিগকে এইরূপে দোল দিয়া, শেষে বলিতেন, "এখন আমার পালা;" তখন সকল বালক মিলিয়া মহা উল্লাসে তাঁহাকে দোলাইত। প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে এইরূপ শিশুর ন্যায় সরলতা কেমন সুন্দর!

তাঁহার হৃদয়ের এক দিক্ যেমন বালক বালিকাদিগের প্রতি ব্যবহারে, সেইরূপ আর এক দিক্ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহারে প্রকাশ পাইত। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার তাঁহার অতি চমৎকার ছিল। স্ত্রীজাতিকে তিনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট শোনা গিয়াছে যে, তিনি যখন বসিয়া থাকিতেন, তখন কোন স্ত্রীলোককে তিনি দাঁড়াইয়া কথা বলিতে দিতেন না। হয়, স্ত্রীলোকটিকে বসাইতেন, নতুবা নিজে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, তিনি, চিরদিন স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী। সতীদাহ নিবারণের জন্য, তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতে আছে, সতীদাহ নিবারণের জন্য, কেবল রাশি রাশি পুস্তকের দুই তিন সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া, ইংরেজিতে তাহার অনুবাদ করিয়া এবং দেশে বিদেশে বিতরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তিনি সতীর প্রাণরক্ষা করিবার জন্য অপমানকে অপমান জ্ঞান করেন নাই। সতীদাহ হইবে শুনিয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া অবমানিত হইয়াছেন। সঙ্গে যে ভৃত্য ছিল, সে প্রভুর অপমান দেখিয়া অপমানকারীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; কিন্তু রামমোহন রায়ের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি ভৃত্যকে শান্ত করিলেন। তাঁহার পক্ষে কিসের মান আর কিসের

অপমান, তিনি পরমেশ্বরের আদেশে, নারীজাতির মঙ্গলোদ্দেশে আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ?

নারীজাতির মঙ্গলোদ্দেশে রামমোহন রায় বহু বিবাহ নিবারণ জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের দুর্দ্দশা ও কষ্টের জন্য তাঁহার হৃদয়ে গভীর বেদনা ছিল।

রামমোহন রায় চিরদিনই বহুবিবাহের অতিশয় বিরোধী ছিলেন। এই সম্বন্ধে আপনাদের নিকটে একটি গল্প করিব। কলিকাতার দক্ষিণে বোড়াল গ্রামনিবাসী নন্দকিশোর বসুর বিবাহের সম্বন্ধের সময়, তাঁহার ভাবী শ্বশুর তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য, প্রতারণা করিয়া একটী সুন্দরী বালিকা দেখাইয়াছিলেন। নন্দকিশোর সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া বিবাহে মত দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের সময় একটি কৃষ্ণবর্ণা বালিকাকে আনিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। নন্দকিশোর, সেই জন্য, শ্বশুরের প্রতিহিংসা করিবার জন্য নিজে মনোনীত করিয়া আর একটী বিবাহ করিবেন, মনে করিলেন। রামমোহন তাঁহাকে সেরূপ বিবাহ করিতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এ কর্ম্ম অন্যায় জানিয়া উহা না করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় তাঁহাকে এইরূপে বুঝাইয়াছিলেন ;—দেখ, যে বৃক্ষ উত্তম ফল প্রসব করে, তাহাই সুন্দর বৃক্ষ ; কেবল দেখিতে সুন্দর হইলে হয় না। সেইরূপ, তোমার স্ত্রী সুন্দরী না হইলেও, যদি তিনি সৎপুত্র প্রসব করেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে অবশ্য, সুন্দরী বলিতে হইবে। এখন দেখুন, বিধাতার ইচ্ছায় কি হইল ! নন্দকিশোর বসুর সেই স্ত্রীর গর্ভে প্রাতঃস্মরণীয়, ভক্তি ভাজন সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জন্ম। এই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, মহাত্মা রাজার প্রতিষ্ঠিত কার্য্যে, কি ব্রাহ্মসমাজে, কি অন্যান্য সংস্কার কার্য্যে যেরূপ আপনার প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, এরূপ আর কয়জন করিয়াছেন ?

রামমোহন রায়ের হৃদয় ও তাঁহার শিষ্যগণ, রামমোহন রায়ের হৃদয় ও বালকবালিকাগণ, এবং রামমোহন রায়ের হৃদয় ও নারীজাতির বিষয় অতি সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। এখন রামমোহন রায়ের হৃদয় ও গরীব দুঃখী লোক সম্বন্ধে কিছু বলিব।

গরিব দুঃখীর প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ও দয়া অতিশয় ছিল। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহার নিবাসগ্রামে একটি বাজার ছিল। পূর্ব্বে বাজারের ব্যাপারীদের নিকট তোলা গ্রহণ করা হইত না। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ ব্যাপারীদের নিকট তোলা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা বড় কষ্ট বোধ করিল। এক সময়ে রাম-মোহন রায় তথায় গমন করিলে, তাহারা এজন্য তাঁহার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রকে ডাকাইয়া, সকল কথা শুনিয়া, কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন "হা পরমেশ্বর! এই সকল দুঃখীলোক সামান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া উদরান্নের সংস্থান করে, ইহাদেরও উপর অত্যাচার! রাধাপ্রসাদ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সেই দিন অবধি তোলা গ্রহণও রহিত হইল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে, দুঃখীলোকদিগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রকাশ পাইত। এক দিবস তিনি চোগা চাপ্‌কান পরিয়া বহুবাজারে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, একজন তরকারীওয়ালা তাহার বোঝা নামাইয়া আর উহা তুলিতে পারিতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়া তাহার মস্তকে মোট্‌টী তুলিয়া দিলেন।

আমার শিক্ষক, হরিনাভি নিবাসী পরলোক গত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি এক দিবস দেখিলেন যে, রাজা রামমোহন রায় এক জন মুটিয়ার সহিত বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের তুল্য এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে মুটিয়ার

সহিত বসিয়া কথা কহিতে দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটে গিয়া শুনিলেন, রাজা মুটিয়াকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কলিকাতা নগরে সর্ব্ব শুদ্ধ কত মুটীয়া আছে। তিনি মুটীয়াদিগের অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সকল তাহার নিকট অনুসন্ধানের দ্বারা জ্ঞাত হইতেছিলেন।

একজন দরিদ্র ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম্ম উপদেশ শ্রবণ করিতেন। উপযুক্ত বস্ত্রাভাবে তিনি কয়েক দিবস তাঁহার নিকট আসিতে পারেন নাই। এই কথা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ;—"আপনি জানিবেন যে, আমি কখন পোষাক দেখিয়া মানুষ চিনি না।"

এমন দেখিতে পাই যে, সামান্য ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াই লোকে আপনাকে জমিদার বলিয়া অহঙ্কার করে; আর দুঃখী প্রজার বিরুদ্ধে জমিদারের পক্ষ সমর্থন করিতে উৎসাহী হয়। তিনি জমিদারের পুত্র। নিজে জমিদার। তাঁহার সাহায্যকারী বন্ধুগণ অনেকেই প্রধান প্রধান জমিদার: বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকীর কালীনাথ রায়, তেলিনী পাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, প্রভৃতি সকলেই বড় বড় জমিদার। অথচ রামমোহন রায়, কি ভারতবর্ষে, কি ইংলণ্ডে, চিরদিন দুঃখী রাইয়ত দিগেরই পক্ষপাতী। পার্লেমেণ্টের কমিটির প্রশ্ন সকলের উত্তরে, ভারতের দুঃখী প্রজার পক্ষ হইয়া, রামমোহন রায় কিরূপ সুযুক্তিপূর্ণ কথা সকল বলিয়াছিলেন, যাহাতে প্রজার দুঃখ দূর হয়, যাহাতে আর তাহা-দিগকে করভারে বিপন্ন হইতে না হয়, সে জন্য, দুঃখীর বন্ধু রামমোহন, প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডবাস কালে, তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধের উপসংহারে এইরূপ বলিতেছেন ;—"With beseeching any and every authority to devise some mode of alleviating the present

discharge their duty to their fellow-creatures and fellow-subjects.

রামমোহন রায়ের মহৎ হৃদয় সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা বলিব। রাজা যখন বিলাত গমন করেন, জাহাজে তাঁহার সঙ্গে দুই জন ভৃত্য ছিল। তাহারা সমুদ্রপীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। তিনি তাহাদের সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহাদিগকে আপনার ক্যাবিনে থাকিতে দিয়া অন্য একটি স্থানে অত্যন্ত কষ্ট করিয়া থাকিতেন, তথাচ, এমনি সদয়-হৃদয় ও স্নেহপরবশ ছিলেন যে, তাহাদিগকে তথা হইতে কোন ক্রমেই অন্তরিত করিতে চাহিতেন না।

ভৃত্যদিগকে তিনি সন্তানবৎ যত্ন করিতেন। সেই জন্য তাঁহার পরলোক গমনের পর, তাঁহার ভৃত্যদের যারপরনাই শোক হইয়াছিল। রাজার ভৃত্য রামহরি দাস বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বৰ্দ্ধমান দেলখোস বাগের কর্ত্তারূপে (Head gardener) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রামহরি দাস এক দিবস আমার জ্ঞাতিভ্রাতা, মহারাজার সভাপণ্ডিত, স্বর্গীয় তারকনাথ তত্ত্ব-রত্ন মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন যে, গৃহপ্রাচীরে রামমোহন রায়ের একখানি ছবি লম্বমান রহিয়াছে। ছবি খানি দেখিয়া রামহরি অতিশয় মুগ্ধ হইলেন। ভক্তির উচ্ছ্বাসে অভিভূত হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্রধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ছবি প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া গভীর ভাবের সহিত বলিতে লাগিলেন, "আহা! আহা! মহ পুরুষ! মহাপুরুষ!" যে প্রভুর উপরে ভৃত্যের এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি, সে প্রভু যে কিরূপ মহৎ চরিত্রের লোক তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমি এই ঘটনাটির বিষয় স্বর্গীয় পণ্ডিতবর তারকনাথ তত্ত্বরত্নের পুত্র শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।

রামমোহন রায় স্বাধীন ভাব অত্যন্ত ভালবাসিতেন। নীচতা ও ক্ষুদ্রতা তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার জীবনের একটি ঘটনার

কথা বলি। একবার তিনি কলিকাতার বিসপ মিডিলটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বিসপ, তাঁহাকে সাংসারিক প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া, অর্থাৎ ক্ষমতা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির কথা বলিয়া খ্রীষ্টিয়ান হইতে অনুরোধ করেন। ইহাতে বিসপের প্রতি তাঁহার যার পর নাই বিরক্তি ও অশ্রদ্ধা হইয়াছিল। সেজন্য জীবনে আর কখন তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই।

রামমোহন রায় সর্ব্বদা নিজের মতে দৃঢ় থাকিতেন, অথচ অন্যকে মত-বিষয়ক স্বাধীনতা দান করিতেন। অন্যের মনে যাহাতে আঘাত লাগে, এমন ভাবে কখন কথার উত্তর দিতেন না। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মোহিত হইত। কোন ব্যক্তির মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়াও, তিনি এমন ধীর ও শান্ত ভাবে তাহা করিতেন যে, সে ব্যক্তির মনে কোন ব্যথা না লাগে। একদিন ইংলণ্ডের কোন ভদ্রলোকের বাটীতে বসিয়া তিনি এমন ভাবে মৌলিক পাপ (Original sin) বিষয়ে একটি কথা বলিলেন, যাহাতে বুঝা গেল যে, তিনি উক্তমতে বিশ্বাস করেন না। সেখানে এমন একটি ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন, যিনি ইহাতে চমকিত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আপনি উক্ত মতে অবশ্য বিশ্বাস করেন?" রামমোহন রায় স্ত্রীলোকটির মুখপানে চাহিলেন। স্ত্রীলোকটির মুখে লজ্জা প্রকাশ পাইল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই রাজা সকলই বুঝিয়া লইলেন, এবং অতি ধীরভাবে অবনত হইয়া বলিলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, এই মতদ্বারা অনেক সৎলোকের পক্ষে, খ্রীষ্টীয় নীতির মধ্যে উচ্চতম ধর্ম্ম যে বিনয়, তাহার উন্নতি হইয়াছে। আমার পক্ষে আমি বলিতে পারি যে, আমি এই মতের প্রমাণ কখন প্রাপ্ত হই নাই।" সেই স্ত্রীলোকটি রামমোহন রায়কে যাহা বলিয়াছিলেন, তজ্জন্য পরদিন প্রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিলেন; আসিয়া বলিলেন যে, রামমোহন রায় তাঁহার কথার যেরূপ ভাবে উত্তর

করিয়াছিলেন, তিনি কখন কোথাও, কোন ভদ্র সমাজে, এমন সুন্দর কিছু দেখেন নাই।

রাজার জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জগতের যে সকল নৈতিক (Moral) সম্বন্ধ তিনি সকল সম্বন্ধই রক্ষা ও পালন করিয়াছিলেন। মাতাপিতার সহিত সম্বন্ধ :—তিনি মাতাপিতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। সন্তানগণের সহিত সম্বন্ধ :—সন্তানগণকে যথোপযুক্ত যত্নের সহিত পালন করিয়াছিলেন। দাম্পত্যসম্বন্ধ ; স্ত্রীর প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য তাহা করিয়াছিলেন। প্রতিবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য, গ্রামবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য, স্বদেশবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য, মানবজাতির প্রতি কর্ত্তব্য, সকল কর্ত্তব্যই তাঁহার জীবনে প্রতি-পালিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পারিবারিক কর্ত্তব্য, সামাজিক কর্ত্তব্য, রাজনৈতিক কর্ত্তব্য, সকল কর্ত্তব্যই তাঁহার জীবনে প্রতিপালিত হইয়াছে। কিন্তু সকল কর্ত্তব্যের মূল যে কর্ত্তব্য, ইষ্ট দেবতার প্রতি, পর-মেশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য, সেই দিকেই তাহার প্রধান দৃষ্টি ছিল। ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের প্রধান ভাব। কুমারী কলেটও এই কথাই বলিয়াছেন। এরূপ জীবনকে আদর্শ জীবন বলিব না ত কি বলিব ?

এখন তাঁহার চরিত্রে সামঞ্জস্যের বিষয় এক একটি করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথম, কোমলতা ও কঠিনতা। কোমলতা বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি। এখন তাঁহার মনের দৃঢ়তা সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। তাঁহার আশ্চর্য্য অটল ভাব বিষয়ে একটী গল্প করিব। কলিকাতার সান্কি ভাঙ্গার ভবানী চরণ দত্ত (যাঁহার নামে একটি গলি আছে) এবং নীলমণি কেরাণী, রামমোহন রায়ের পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, রামমোহন রায় যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী কি না পরীক্ষা করা আবশ্যক। তিনি যদি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী হন, তাহা হইলে, তিনি অবশ্য শোকে তাপে

অধীর হবেন না। সেই জন্য, তাঁহারা একটি কৌশল করিলেন। সে সময়ে ডাক ছিল না। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পত্রাদি হরকরার দ্বারা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। ঐ হরকরাকে কাসীদ্ বলিত। ভবানী চরণ ও নীলমণি একটী লোককে কাসীদ্ সাজাইয়া তাহাকে রামমোহন রায়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। সে ব্যক্তি এক জাল পত্র লইয়া রামমোহন রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পত্রখানি রামমোহন রায়ের হস্তে দিয়া মিথ্যা করিয়া বলিল, আমি কৃষ্ণনগর হইতে আসিতেছি। ঐ পত্র খানিতে মিথ্যা করিয়া লেখা ছিল যে, রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ, যিনি কৃষ্ণনগরে চাকুরী করিতেন, তাঁহার তথায় মৃত্যু হইয়াছে। রামমোহন রায় পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ভবানী চরণ ও নীলমণি পূর্ব্বেই আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া ছিলেন। পত্র পাঠ করিয়া রামমোহন রায়ের মুখ ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া যে কার্য্য করিতেছিলেন, তাহাতে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন। ভবানীচরণ ও নীলমণি দৃঢ়তা ও অটল ভাবের এই অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিয়া অবাক্ হইলেন, একেবারে তাঁহার চরণের উপর গিয়া পড়িলেন এবং সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

রামমোহন রায় তাঁহার দৈনিক জীবন কিরূপভাবে কাটাইতেন, তিনি কিরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন, তাহা বলিতেছি। তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন এইরূপ ছিল ;—রামমোহন রায় প্রত্যহ শেষ রাত্রি চারিটার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া কাফী পান করিতেন। তাহার পর কয়জন লোকের সহিত একত্রে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইতেন। সচরাচর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তিনি বাটীতে ফিরিতেন। তৎপরে প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য সকল করিবার সময়, গোলকদাস নাপিত তাঁহাকে সংবাদপত্র সকল পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাহার পর চা পান করিত। তাহার পর ব্যায়াম করিতেন। তাহার

পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া চিঠিপত্র পাঠ করিতেন। তৎপরে স্নান করিতেন। স্নানের পূর্ব্বে দুইজন স্থূলকায় ব্যক্তি রামমোহন রায়কে তৈল মর্দ্দন করাইতেন। এই সময় রাজা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র সকল প্রতিদিন পরে পরে আবৃত্তি করিতেন। স্নানের সময় এমন সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, মহর্ষি মনে করিতেন, তাহাই তাঁহার উপাসনা। বেলা ১০ ঘটিকার সময় ভোজন করিতেন। ঘরের মেজেতে পা গুটাইয়া বসিয়া দেশীয় প্রণালীতে আহার করিতেন। তাঁহার সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে দেশীয় খাদ্য সকল থাকিত। এই সময় ভাত ও মৎস্য এবং সম্ভবতঃ দুগ্ধ আহার করিতেন। ভোজনের সময় কোন ব্যক্তি সংবাদপত্র পাঠ করিতেন, তিনি শ্রবণ করিতেন। আহারের পর একটা টেবিলের উপর এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন। তিনি বেলা ২টা পর্য্যন্ত কাজ করিতেন। অপরাহ্নে ইয়োরোপীয় বন্ধুদিগের সহিত দেখা করিতেন। ৭টা ও ৮টার মধ্যে সায়াহ্ন ভোজন করিতেন। নিশীথকাল পর্য্যন্ত বন্ধুগণের সহিত ধর্ম্মালাপ চলিত।

তাঁহার চরিত্রের সামঞ্জস্য বিষয়ে আমরা কোমলতা ও কঠিনতা, এই দুই দিকই প্রদর্শন করিয়াছি। যেমন তাঁহার স্বদেশপ্রেম, তেমনি তাঁহার মানবজাতির প্রতি প্রেম। তাঁহার বিশ্বজনীন হৃদয়ে সমগ্র মানবজাতি স্থান পাইয়াছিল। স্পেন দেশে নিয়মতন্ত্র প্রণালীরাজশাসন সংস্থাপিত হইল শুনিয়া তাঁহার এত আনন্দ হইয়াছিল যে, তিনি কলিকাতা টাউনহলে একটি প্রকাশ্য ভোজ (Public dinner) নিজ ব্যয়ে দিয়াছিলেন। তাঁহার উদার হৃদয়ে যেমন সমগ্র মানবজাতির স্থান ছিল, তেমনি, কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সকল বিষয়েরই স্থান ছিল। একদিন বকল্যাণ্ড সাহেবের সহিত তাঁহার দেখা করিবার কথা ছিল। দেখা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, নেপল্‌স্ দেশে

পাইয়াছি যে, আজ সেই জন্য আপনার সহিত দেখা করিতে পারিলাম না। কি আশ্চর্য্য বৈদেশিক সহানুভূতি! ফরাসীবিপ্লবের সময় তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত উহার সংবাদ লইতেন। গ্রীস দেশের সহিত তুরস্কদেশের যুদ্ধের সময়,প্রগাঢ় আগ্রহের সহিত গ্রীসবাসীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

রামমোহন রায়, যে জাহাজে বিলাত যাইতেছিলেন, তাহা যখন উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছিল, তখন তিনি দুই এক ঘণ্টার জন্য তীরে উঠিয়াছিলেন। জাহাজ ফিরিয়া আসার পর একটি দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। যে সোপানে (Gangway ladder) পদনিক্ষেপ করিয়া জাহাজের ভিতরে আসিতে, ও ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে হয়, তাহা উপযুক্তরূপে সংস্থাপিত হয় নাই বলিয়া, তিনি পড়িয়া গিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। চরণে আঘাত প্রাপ্তির জন্য, তিনি আঠার মাস খঞ্জাবস্থায় কষ্ট পাইয়াছিলেন। এমন কি, ইহ জীবনে আর কখনই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু রামমোহন রায় এমন লোক ছিলেন না যে, কোন প্রকার শারীরিক কষ্টে তাঁহার মনের বেগ নিবারিত হয়। দুই খানি ফরাসী জাহাজ, স্বাধীনতার পতাকা বহন করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। রামমোহন রায়, স্বাধীনতাকে এত ভাল বাসিতেন যে, শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও, তিনি ফরাসী-জাহাজে একবার যাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। ফরাসীজাহাজে স্বাধীনতার পতাকা দেখিয়া তাঁহার উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শরীরের কষ্ট তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। উৎসাহে কষ্টবোধ চলিয়া গেল। তাঁহাকে ফরাসী জাহাজে লইয়া যাওয়া হইল। সেই জাহাজের ফরাসীগণ, তাঁহাকে উপযুক্তরূপ অভ্যর্থনা করিলেন। ফরাসীস্বাধীনতাপতাকার নিম্নে আসিয়া তিনি কত আনন্দলাভ করিয়াছেন, তাহা তিনি ইণ্টার প্রেটারের দ্বারা ফরাসীগণকে জানাইলেন। তাঁহার এত আনন্দ হইল কেন? পার্থিব

শক্তির উপর ন্যায়ের জয় প্রকাশ হইতেছে বলিয়া তাঁহার এত আনন্দ! ফরাসী-জাহাজ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়, তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন; Glory, glory, glory to France! ফরাসীদেশের গৌরব! ফরাসীদেশের গৌরব! ইত্যাদি

তাঁহার জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সামঞ্জস্য অতি চমৎকার! তাঁহার সময়ে, ইয়োরোপের আলোক এদেশে এরূপ সমুজ্জ্বল ভাবে, প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল যে, যাঁহারা তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, এদেশের কিছুই তাঁহাদের ভাল বোধ হইত না। এ বিষয়ে রাজার দৃষ্টান্ত অতি আশ্চর্য্য! তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রভাব অনুভব করিয়াও, প্রাচ্য জ্ঞানের মহিমা বিস্মৃত হন নাই। এক দিকে, তিনি যেমন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জয় ডঙ্কা বাজাইলেন, ইয়োরোপীয় জ্ঞানপ্রচার ব্যতীত এ দেশের অজ্ঞান কুসংস্কার বিদূরিত হইয়া সমাজ সংস্কৃত হওয়া সম্ভব নহে, ইহা রাজ পুরুষগণকে বুঝাইয়া দিলেন, আবার অন্য দিকে, ভারতের মহর্ষিগণের মহা-মূল্য বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের তত্ত্ব,—তাঁহাদিগের অমূল্য ব্রহ্মজ্ঞান, সর্ব্বসাধা-রণের সম্মুখে ব্যাখ্যা করিয়া জনসমাজের কল্যাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞানচক্ষু পাশ্চাত্য আলোক ধারণ করিল, কিন্তু তাহাতে ঝল্‌সি গেল না। এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে যে সত্যালোক ছিল, তাহাও দেখিতে তিনি সক্ষম হইলেন। কি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য!

রামমোহন রায়ের তর্কশক্তি ও কবিত্ব শক্তি, ভাবপ্রবণতা ও বিচার-বুদ্ধির সামঞ্জস্য দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। তাঁহার রচিত সঙ্গীত সকল তাঁহার কবিত্ব শক্তির অমোঘ প্রমাণ। আমার বন্ধু মহাপণ্ডিত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বলেন যে, তাঁহার তর্কশক্তি, সুপ্রসিদ্ধ ইয়োরোপীয় পণ্ডিত হিউমের তুল্য। কিন্তু তাঁহার এই প্রখর তর্কশক্তি, তাঁহার কবিত্ব-শক্তি ও ভাবুকতায় কিছুই হানি করিতে পারে নাই। এ উভয়ের মধ্যে

সুন্দর সামঞ্জস্য ছিল। সেই জন্য, তাঁহার ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল হইলেও,উহা কখন তাঁহাকে উন্মত্ত করিত না। ভক্তিবৃত্তি অত্যন্ত অধিক হইলেও, উহা কখন অপাত্রে পতিত হইত না।

১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাজা পরলোক যাত্রা করেন। তৎপরে ১৮৩৪ সালের জুন মাসের Phrenological Journal পত্রিকায় রাজার মস্তিষ্ক ও মনোবৃত্তির সমালোচনা প্রকাশ হয়। উহাতে তাঁহার ভক্তিবৃত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল।

His head and history concur in showing that, intellect, Justice and independence had with him equal control over the sentiment of veneration. He seams never to have venerated except in accordance with inlellect and conscientiousness. The whole tendency of his mind was opposite to superstition and religious fanaticism. Wonder had but little sway. He submitted everything to the test of consistency and reason, while conscientiousness restrained him from running to wild and inpracticable extremes in his projects of reform.

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তিনি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকে মান্য করিয়াও বৈষ্ণবরাজ শ্রীচৈতন্যকে চৈতন্যদেব বলিয়া সম্মান করিতেন। তাঁহার মনোবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল বলিয়াই তিনি এরূপ করিতে পারিতেন। তাহার প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল বলিয়াই তিনি যীশু, শ্রীচৈতন্য, ও মহম্মদ এই তিন জন মহা পুরুষকেই ভক্তি করিতে পারিতেন।

রাজার বন্ধু উইলিয়েম্ আড্যাম সাহেব ১৮২৬ সালে লিখিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় মহম্মদের একটি জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা শেষ করিতে পারেন নাই। রামমোহন রায় মনে করিতেন যে

মহম্মদের শত্রু মিত্র উভয় দ্বারাই তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অমূলক কথা রটনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা যদি মহম্মদের একখানি জীবনী লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে উহা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইত। একেশ্বরবাদ মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান মত বলিয়া উক্ত ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। মুসলমান ধর্ম্মের একেশ্বরবাদের দ্বারা হিন্দু পৌত্তলিকতা বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে এদেশের যে উপকার হইয়াছে, ইহা তিনি বিশেষরূপে অনুভব করিতেন। কোন প্রকার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, তিনি আহ্লাদের সহিত মহম্মদের উপদেশ ও চরিত্রের পক্ষ সমর্থন করিতেন।

তাঁহার জীবনে স্বদেশীয় ধর্ম্ম ও বিদেশীয় ধর্ম্মের চমৎকার সামঞ্জস্য ছিল। সকল ধর্ম্মের মধ্যেই তিনি সার সত্য, বিশ্বজনীন সত্য দেখিতে পাইতেন। মহা পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাঁহাকে Father of Comparative Theology বলিয়াছেন। সংস্কৃত, আরবি, হিব্রু, গ্রীক ভাষায় মূল ধর্ম্মশাস্ত্র, হিন্দুশাস্ত্র, কোরান, য়ীহুদী শাস্ত্র, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার মধ্যে এক মূল সাধারণ সত্য, বিশ্বজনীন সত্য দেখিলেন; এক বিশ্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আবিষ্ক্রিয়া করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পুরাণে যেমন আছে যে, দেবতারা সপ্ত সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ, আমাদের রাজা, সকল শাস্ত্রসিন্ধু হইতে, সারধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া আপনি ধন্য হইলেন ও জগৎকে ধন্য করিলেন। ইহা ভগবানের কৃপায় তাঁহার উদার হৃদয়েরই ক্রিয়া।

রাজার পত্নী শ্রীমতী উমাদেবী তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোন্ ধর্ম্ম সত্য?" রাজা উত্তর করিলেন; "গরু নানা বর্ণের, কোনটা কাল, কোনটা সাদা। কিন্তু তাহাদের দুগ্ধ একইবর্ণের। সেইরূপ, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নানা প্রকার। কিন্তু সেই সকলের মধ্যে যাহা সত্য, তাহা একই"। বিশ্বজনীন ধর্ম্মের আবিষ্কার করিয়া, রাজার এই উদার ভাব হইয়া

ছিল। ইহা হইতেই তিনি সার্ব্বভৌমিক, অসাম্প্রদায়িক উপাসনার ভাব (Universal, Unsectarian Worship) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভাব হইতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ভাব হইতেই তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীড লিখিয়াছিলেন। এইটী জগতের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন ভাব। (Original idea.) ব্রাহ্মদের উচিত, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায়, এই বিশ্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক ভাবটি রক্ষা করিতে যত্ন করেন। যেন সমাজের প্রকাশ্য উপাসনায় কোন সাম্প্রদায়িক ভাব আসিয়া না পড়ে। এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ভাবকে রাজা যার পর নাই ভাল বাসিতেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলেন, যে, যখন রাজা, তাঁহার শিষ্যদিগকে এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের বিষয় বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন, তিনি ভাবে অভিভূত হইয়া যাইতেন, এবং তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত।

ইহা ছাড়া, রাজা মনে করিতেন যে, খ্রীষ্টীয় জগতে লুথরের যে কার্য্য, এ দেশে তাঁহার সেই কার্য্য। তিনি ডফ্ সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে, লুথর যেমন খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের সংস্কার করিয়া গিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ, হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার করিয়া, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মজ্ঞান প্রচার করিতেছেন।

তাঁহার চরিত্রে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সুস্পষ্ট সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। এমন জ্ঞানী জগতে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার ভক্তি জ্ঞানের সহযোগী। শুনিয়াছি, তিনি প্রতিদিন মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া কয়েক ঘণ্টা ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পর, প্রতি সপ্তাহে সমাজের দিনে মানিকতলা হইতে জোড়াসাঁকো সমাজ মন্দিরে গিয়া একটী মোড়ার উপর বসিয়া বিষ্ণুর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অজস্র ধারে প্রেমাশ্রু পাত করিতেন। কুমারী কলেটের রামমোহন রায়ের

সর্ব্বদাই তাঁহার চক্ষু প্রেমাশ্রুতে সিক্ত হইত। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মশীল লোক জগতে কয়জন জন্মিয়াছে? তাঁহার কর্ম্মকে কর্ম্ম না বলিয়া জীবের সেবা বলাই উচিত। বিলাতে অবস্থিতিকালে, তাঁহার ইংলণ্ডীয় বন্ধুগণের নিকট তিনি বলিয়াছিলেন যে পরমেশ্বরের সেবা আমরা কি করিতে পারি? তাঁহার কি অভাব আছে যে, আমরা তাঁহার সেবা করিব? তবে তাঁহার সেবার যদি কোন অর্থ থাকে, তাহা এই যে, তাঁহার সন্তানদের সেবাতেই তাঁহার সেবা। তাঁহার চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও সেবার আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতার পক্ষে, এইরূপ জীবনই উপযুক্ত জীবন।

তিনি মহাজ্ঞানী ও কর্ম্মশীল ছিলেন। কিন্তু উপাসনাই তাঁহার জীবনের অবলম্বন ছিল। ভগবদ্ভক্তিই তাঁহার সকল কার্য্যের ভিত্তিমূল ছিল। রাজার প্রকৃতির সকল বিভাগের সামঞ্জস্য থাকিলেও, ধর্ম্মই তাঁহার প্রধান ভাব। উপাসনা রাজার চিরসঙ্গী। যখন স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তখনও মনে মনে উপাসনা করিতেন; যখন কোথাও যাইতেন, পথে যাইতে যাইতে উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন।

ইংলণ্ডে যখন তিনি হেয়ার সাহেবের ভ্রাতৃগণের বাটীতে বাস করিতেন, তখন কুমারী হেয়ার, সর্ব্বদা তাঁহার ভাব দেখিয়া, বিবি এস্‌লিন্‌কে তদ্বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, বিবি এস্‌লিন্ এইরূপে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন;—

He was, also, in a constant habit of prayer and was not interrupted in this by her presence. Whether sitting or riding, he was frequently in prayer. He told Miss H. that whenever an evil thought entered his mind, he prayed. She said I do not believe, you ever have an evil thought He answered "O, yes we are all liable to evil thoughts." তিনি কুমারী

করে, তিনি তখন প্রার্থনা করেন। এ কথায় কুমারী হেয়ার তাঁহাকে বলিলেন, আমি বিশ্বাস করিনা যে, আপনার মনে কখন কোন মন্দ চিন্তা আসে। রাজা উত্তর করিলেন, হঁ" ! হাঁ ! আমাদের সকলেরই মনে মন্দ চিন্তা আসিতে পারে।

রাজার মনে যে মন্দ চিন্তা আসিত এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। মানুষ যত পবিত্রতার পথে অগ্রসর হয়, যত তার বিবেক বিশুদ্ধতর হইতে থাকে, ততই তাহার পাপ পুণ্যের বোধ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। সাধারণ লোকের নিকট যাহা পাপ বলিয়া বোধই হয় না, পবিত্রাত্মা মহাত্মারা তাহাকেই পাপ বলিয়া অনুভব করেন। একবার স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন, "প্রকৃত ব্রহ্মভক্তের নিকট পরমেশ্বরকে ভুলিয়া থাকাই পাপ।" সাধারণতঃ ধর্ম্মনিয়মের (Moral law) উল্লঙ্ঘনই পাপ। কিন্তু সাধু মহাত্মাদের নিকট উচ্চ ধর্ম্মজীবনের অভাব ও ত্রুটি সকলও পাপ। যিনি উচ্চ শ্রেণীর ভগবদ্ভক্ত, ও প্রেমিক, তিনি প্রেমময় পরমপুরুষকে বলেন, তোমাকে যদি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে না পারিলাম, তোমার মত মাতা পিতাকে যদি প্রাণের সহিত ভক্তি করিতে না পারিলাম, তবে কি আমি তোমার অপরাধী পুত্র নই ?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তিনি তাঁহার বন্ধু ও শিষ্যগণকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি যেখানে থাকিতেন, তাঁহার প্রেমময় হৃদয় চতুঃপার্শ্বস্থ লোককে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। এ দেশে যেমন, ইংলণ্ডেও সেইরূপ। পূর্ব্বে যে ১৮৩৪ সালের জুন মাসের ফ্রেনোলজীক্যাল্ জার্ন্যাল্ হইতে তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য বিষয়ে কিছু পাঠ করিয়াছি ; সেই পত্রিকা হইতেই আর একটু উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিতেছি।

His large adhesiveness accords with his affectionate dis-

position. His English friends bears testimony to the power the Raja had shown of inspiring warm personal affection. It is no small testimony to his character that, even a slight acquaintance with him, was enough to stir stolid and phlegmatic English men to something very nearly a passion of love for him. There must have been much love in the man to evoke such devotion.

তাঁহার কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মানুরাগ! চিরজীবন সেই এক লক্ষ্য। ষোড়শবর্ষ বয়স্ক রামমোহন যে ব্রহ্ম নামের পতাকা হস্তে ধারণ করিলেন, স্বদেশে কি বিদেশে, জীবনে কি মরণে, কখন তাহা ছাড়িলেন না। ধর্ম্মের জন্য কি স্বার্থত্যাগ! এ স্থলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার একটি বক্তৃতায় রামমোহন রায়ের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আপনাদের সম্মুখে পাঠ করিতেছি।

"প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজের কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও তেমনি সারবান ছিল। শ্রদ্ধা, ভক্তি, হৃদয়ের ধনও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখশ্রী আমার চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেছে। তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ, তাঁহার সেই উদার ভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁহার শরীরের বল, মনের বীর্য্য, হৃদয়ের ভাব, সকলই অনুরূপ। ধর্ম্মের উন্নতির জন্য তিনি এখানে উদিত হন। তিনি জীবনের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত একাকী অসংখ্য প্রকার পৌত্তলিকতার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন, এবং সকলকে পরাভূত করিয়া অবশেষে গঙ্গার স্রোতের উপর এই সমাজরূপ জয়স্তম্ভ নিখাত করিলেন। ... ... তিনি যে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন অন্ধকারের কাল,

দ্বিপ্রহর রজনীর কাল ; এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝাইতে পারি না, সে সময় ব্রাহ্মসমাজের নামে সকলে খড়্গহস্ত হইত। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্য ছিল ; ভ্রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা শত সহস্র শত্রু দ্বারা আবৃত হইয়া কুঠার হস্তে সেই ঘোর অবিদ্যা অরণ্য সমভূমি করিয়া দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবশেষে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজরূপ বীজ বপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন। এখন দিনে দিনে জ্ঞানপ্রভাবে বঙ্গদেশের ধর্ম্মক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের সুবিধা ও ফলের প্রাচুর্য্য হইয়া আসিতেছে। তখন সে প্রকার ছিল না। তখন বিংশতি বৎসরে যাহা হইত, এখন এক বৎসরে তাহা সম্পন্ন হয়। যে সময়ে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্মধর্ম্মকে এ সংসারে আনিতে পারিত না। তাঁরই প্রখর জ্ঞানাস্ত্রে কুসংস্কার রূপ অরণ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল, তাঁরই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবিষ্ট হইল ···· তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য যত্ন করিতে হইয়াছিল ; তাঁর ধন গেল, সমুদয় বিষয় গেল, দিল্লির বাদসাহের বেতনভোগী পর্য্যন্ত হইয়া জীবন পোষণ করিতে হইয়াছিল। তখন তাঁর মনে এই আনন্দ ছিল যে ভবিষ্যৎ বংশ আমার আশা সফল করিবে। তাঁর এই ভাব ছিল যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন, আমরা একত্র হইয়া ইহাকে ব্যবহার করিব, আমরা কর্ষণ করিয়া ইহাকে উর্ব্বরা করিব। অতএব, তিনি আপনার গৃহকার্য্যে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার শতগুণ, এক ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংস্থাপনের জন্য করিতে হইয়াছিল। এক দিনের জন্য নয়, এক মাসের জন্য নয়, কিন্তু ষোড়শ হইতে ঊনষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত ইহাতে সমান ভাবে তাঁহার সেই যত্নের ফল দেখিয়া কি আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন হইতেছে না ? যে মহাত্মা আপনার হৃদয়ের শোণিত

তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করি ··· ··· যখন কলিকাতায় তিনি প্রথম বাস করেন, যখন ১৭৩৬ শকে একাকী বিদেশী উদাসীনের ন্যায় এখানে আসিলেন, তখন কে তাঁহার সহযোগী হইয়া সাহায্য দিতে পারে ? তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে ও ধর্ম্মের অনুরাগে, বিষয়ী লোকদিগকে আপনার পথে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যখন প্রথম তিনি কলিকাতা নগরে আসিলেন, তখন লোকেরা তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত, ধর্ম্মভ্রষ্ট, নরকে পতিত বলিয়া তিরস্কার করিত। তাঁহার মুখদর্শন করিতে নাই, নাম উচ্চারণ করিতে নাই, এই প্রকার বাক্য সকল তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিত। তাঁর কি এমন বল ছিল যে, সেই বলে লোকের হৃদয় ও মন আকর্ষণ করিলেন ? কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সে সময়কার কলিকাতার ক্ষমতাপন্ন অনেক বড় মানুষ তাঁহার সহচর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিষয়ীদিগের কিসের সম্বন্ধ ছিল ? আপনার ধর্ম্মমূর্ত্তিদ্বারা তিনি তো সকলকে বশীভূত করিতেনই তদ্ব্যতীত, তিনি নানাপ্রকারে বিষয়ীদিগের বিষয়ের উন্নতি করিয়া দিতেন, এবং বিষয়ীরা বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের সাহায্য করিতেন। ধর্ম্মের উন্নতি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু তাঁহার সদ্ভাব দেখিয়া তাঁহার বশীভূত হইতেন ; এবং প্রত্যুপকার বলিয়া রামমোহন রায়ের ধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করিতেন। • • • একদিন রামমোহন রায় বলিলেন যে, ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত দিলে ভাল হয় ; অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইল, এবং নানা ভাবের সঙ্গীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন, "ও সব কেন ? অলখ নিরঞ্জন গাও।" তখন ব্রহ্মসঙ্গীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে একটুকুও তখন কাহারও বুঝা হয় নাই যে, ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত গাহিতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাহিতে হইবে।

১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ এখানে উঠিয়া আসিল। সেই শকে সতী দগ্ধ হওয়াও নিবারিত হইল, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ধর্ম্ম সভাও

স্থাপিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই সভার সভাপতি ছিলেন। তখন সমাজের প্রতি অনেকেই নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন, তথায় নাচ তামাসা নৃত্যগীত হয়, কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায়, ও শেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপরে মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন যে, ব্রহ্মসভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধর্ম্ম-সভা, সতী দগ্ধ করিবার দল। এই দুই দলের মধ্যে কে জয়ী, আর কে পরাজিত তাহা আমরা দেখিতেই পাইতেছি ; কিন্তু সে সময় ধর্ম্ম-সভা প্রবল ছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অতি সঙ্কট কাল ছিল। কেহ বলিতেন, ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন ; কেহ বলিতেন, রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন, কিন্তু তিনি গম্ভীর ভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গা বা জগন্নাথের যাত্রী, দূর হইতে পদব্রজে আইসেন, তিনি তেমনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মানিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন। এই একটী তাঁহার শ্রদ্ধার ভাব ছিল। তখন ইংরাজেরা তাহাতে যোগ দিতেন।"

স্বার্থত্যাগ যেমন মহত্ত্বের প্রমাণ এমন আর কিছুই নহে। রামমোহন রায়ের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সত্যের জন্য তাঁহার আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ। তাঁহার জীবনের প্রথম স্বার্থত্যাগ ষোড়শ বয়সে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখিয়া পিতৃ গৃহ হইতে তাড়িত হওয়া। তাড়িত হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে, ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিলেন। সেই সকল প্রদেশের ধর্ম্মের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া অনেক জ্ঞান লাভ করিলেন। তারপর হিমালয় পার হইয়া তিব্বৎদেশে উপনীত হইলেন। তিব্বৎবাসীদিগের কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিতেন বলিয়া, তদ্দেশীয় পুরুষগণ কখন কখন তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে উদ্যত হইত ; কিন্তু তিব্বৎবাসিনী নারীদিগের দ্বারা তিনি রক্ষা পাইতেন।

তিব্বৎ যাত্রা সম্বন্ধে কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংশয় প্রকাশ করেন। সে সময়ে এরূপ অল্প বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এমন কার্য্যে সংশয় হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক সংশয়ের কোন কারণ নাই। কুমারী কার্পেণ্টার বলেন, রাজা রামমোহন রায় তাঁহার নিকটে ৪০ বৎসর পরেও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তিব্বৎ দেশের ঘটনা সকল স্মরণ করিতেন। তিব্বৎবাসিনী রমণীগণের সদ্ব্যবহার, তাঁহার তরুণ হৃদয়ে নারীভক্তির বীজ বপন করিয়া দিয়াছিল। রামমোহন রায় নিজে কুমারী কার্পেণ্টারকে বলিয়াছিলেন, তিব্বৎবাসিনী রমণীগণের সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তিনি নারী জাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেন।

রামমোহন রায় তিব্বৎ হইতে ভারতবর্ষে ফিরিলেন। তাঁহার পিতা লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে পশ্চিমাঞ্চল হইতে গৃহে আনাইলেন। রামকান্ত রায় আশা করিয়াছিলেন যে, রামমোহন বিদেশ ভ্রমণে অনেক কষ্ট পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বের দুর্ম্মতি অবশ্য দূর হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে দেখিলেন যে, তাঁহার দুর্ম্মতি ষোল আনাই রহিয়াছে; সুতরাং তিনি তাঁহাকে দ্বিতীয়বার গৃহ হইতে দূর করিয়া দিলেন। পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য, তিনি মাতা কর্ত্তৃক তৃতীয়বার পিতৃগৃহ হইতে সপরিবারে তাড়িত হইয়া রঘুনাথপুর নামক গ্রামে গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন।

রংপুরে বিষয় কর্ম্ম করিবার সময় তাঁহার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি সেখানেও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। তজ্জন্য লোকের নিকট ঘৃণিত ও নিন্দিত হইতেন।

চল্লিশ বৎসর বয়সে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া রীতিমত ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করিলেন। রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিলেন। নিজে সর্ব্বপ্রথম দেশীয় ছাপাখানা করিয়া ঐ সকল ছাপাইতে লাগিলেন। দুই তিন সংস্করণ সকলই বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন। কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে কত পুস্তক

লিখিলেন ও সে সকল সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। বিশেষতঃ সতীদাহ নিবারণের জন্য কত পুস্তক লিখিলেন ও অনুবাদ করিয়া ইংরাজীতে তাহা প্রকাশ করিলেন। আমার কোন বন্ধু তাঁহার এক ভৃত্যের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, এই সময়ে রাত্রি ২।৩ টা পর্য্যন্ত জাগরণ করিয়া, লিখিয়া ও পড়িয়া তাঁহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত।

যিনি দেশের জন্য এত করিলেন, দেশের লোক তাঁহার জন্য কি করিলেন? সকল মহাপুরুষের ভাগ্যে যাহা হয় তাহাই হইল। নিন্দা, গ্লানি, কুৎসা, অবিরল স্রোতে বহিতে লাগিল। তাঁহার প্রাণের উপর পর্য্যন্ত আঘাত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার, সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য, রামমোহন রায়ের প্রতি গোড়া হিন্দুদিগের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের ইয়ত্তা থাকিল না। তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্যও গুপ্ত পরামর্শ হইতে লাগিল। তাঁহার জীবন নষ্ট করিবার জন্য সংকল্প হইল।

রামমোহন রায়, দিল্লির বাদসাহের দূত হইয়া ইংলণ্ডে যাইবার জন্য রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইলে, তিনি মার্টিন সাহেবকে আপনার সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়, তাঁহাকে জানাইলেন যে, কতক গুলি লোক, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য গুপ্তভাবে চেষ্টা করিতেছে। মার্টিন সাহেব এই কথা শুনিয়া রামমোহন রায়ের বাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। রামমোহন রায়ের জীবন রক্ষার জন্য, বাটীর সকলকে সর্ব্বদা সশস্ত্র অবস্থায় রাখিলেন। বারুদ, বন্দুক ও ছোরা সকল আনাইয়া রাখিলেন। বাটী রক্ষার জন্য বরকন্দাজ সকল নিযুক্ত করিলেন। রামমোহন রায় যখন বাহিরে গমন করিতেন, তিনি গুপ্তভাবে আপনার বক্ষের মধ্যে একটি ছোরা লইতেন। যে প্রকার যষ্টির মধ্যে তরবারী থাকে, সেই প্রকার একটি যষ্টি হস্তে লইতেন। থিয়োডোর পার্কার যেমন গুলিপোরা

বন্দুক পার্শ্বে রাখিয়া উপাসনালয়ের জন্য ধর্ম্মোপদেশ (Sermon) লিখিতেন, রামমোহন রায়কেও সেইরূপ, আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র হইতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বাহিরে যাইবার সময়, মার্টিন সাহেব তাহার সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহারও সঙ্গে একটি পিস্তল ও তরবারী বিশিষ্ট যষ্টি থাকিত। অস্ত্রধারী ভৃত্যগণও সমভিব্যাহারে থাকিত। শুনা গিয়াছে, তাহার জীবন নাশের জন্য দুইবার তাঁহাকে আক্রমণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়ান মিসনরিগণের রিপোর্টে একথা আছে। সুবিধা পাইলেই রামমোহন রায়ের প্রাণবধ করিবার জন্য, শত্রুপক্ষের গোয়ান্দারা সর্ব্বদা গুপ্তভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিত। ঐ সকল লোক তাঁহার গৃহ-প্রাচীরে, স্থানে স্থানে, বাহির হইতে গর্ত্ত করিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা তাহারা রামমোহনকে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন প্রকার কার্য্য করিতে দেখিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জাতিচ্যুত করিবে।

সে অতি ভীষণকাল ছিল! কেবল ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে নহে; সহমরণ নিবারণ বিষয়েও রামমোহন রায়ের সহিত যোগ রাখিয়া, লোকে পিতৃগৃহ হইতে বিদূরিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আপনাদের নিকটে একটি ঘটনা বলিব।

সতীদাহ রহিত হইলে, রাজা রামমোহন রায়, কলিকাতা টাউনহলে সভা করিয়া, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার কালীনাথ রায় চৌধুরী, বাঙ্গালা অভিনন্দন পত্র, এবং হরিহর দত্ত, ইংরেজী অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

এই হরিহর দত্ত সম্বন্ধে, এস্থলে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। ইনি হিন্দু কলেজের সর্ব্বপ্রথম ছাত্রগণের মধ্যে একজন। ইনি প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুরের সহাধ্যায়ী। টাউনহলে ইংরেজী অভিনন্দন-

পত্রপাঠ করিবার সময়, প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সতীদাহ রহিত হওয়াতে দেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে। ইহার পিতার নাম তারাচাঁদ দত্ত। এই তারাচাঁদ দত্তের বাটী কলিকাতা কলুটোলা, চীৎপুর রোড, ফৌজদারী বালাখানার উত্তরের গলিতে।

ঐ গলির নাম Tara Chand Dutt's Lane. টাউনহলের সভায় হরিহর দত্তের বক্তৃতা শুনিয়া কোন ব্যক্তি তারাচাঁদ দত্তের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র টাউনহলের সভায় বলিয়াছে যে, সতীদাহ নিবারিত হওয়াতে দেশের বিশেষ উপকার হইয়াছে। তারাচাঁদ দত্ত এই সংবাদে পুত্রের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বাটীর দ্বারবানকে আজ্ঞা করিলেন যে, যখন হরিহর বাটী আসিবে তখন তাহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে না দেয়। যখন হরিহর বাটী আসিলেন, তখন দ্বারবান দণ্ডায়মান হইয়া কর্ত্তার আদেশ তাঁহাকে জানাইলেন। হরিহর দ্বারবানকে বলিলেন, তুমি বাবাকে বল, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। দ্বারবান্ কর্ত্তার নিকট গিয়া হরিহরের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, কর্ত্তা বাহির বাটীর বারেন্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন হরিহর তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি অপরাধে আমাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন? তারাচাঁদ তখন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি টাউনহলের সভায় বলিয়াছ যে, সতীদাহ নিবারিত হওয়াতে এ দেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে? হরিহর বলিলেন যে, তিনি তাহা বলিয়াছেন। তখন তারাচাঁদ বলিলেন, তবে তুমি আমার বাটীতে স্থান পাইবে না। তুমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।”

তখন হরিহর মানিকতলায় রামমোহন রায়ের নিকট গমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল ব্যাপার তাঁহাকে জানাইলেন। রামমোহন রায় হাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন “তোমার ও আমার এক দশা। আমিও পিতা

কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছিলাম, তুমিও তোমার পিতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে। তবে, তোমার কোন ভাবনা নাই। তুমি উত্তম লেখাপড়া জান; আর আমার অনেক বড় বড় সাহেবের সহিত আলাপ পরিচয় আছে। আমি তোমার ভাল চাকুরি করিয়া দিতে পারিব।" পরে, রামমোহন রায়, হরিহরের একটি ভাল চাকুরি করিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসভা মন্দির প্রতিষ্ঠার ছয় দিবস পূর্ব্বে ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। ধনীলোক উভয় সভাকেই সাহায্য করিতেন। উভয় সভাদ্বারাই সংবাদপত্র প্রচারিত হইত। পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, নদীতীরে, বাবুদিগের বৈঠকখানায়, নগরে, পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, যেখানে সেখানে, রামমোহন রায় ও ধর্ম্মসভার কথা লইয়া আন্দোলন। রামমোহন রায়কে বিদ্রুপ করিয়া হাস্যরসাত্মক কবিতা সকল, রচিত হইতেও প্রকাশ্য স্থানে আবৃত্তি করা হইত। লোকে শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিত। সঙ্গীত সকলও রচিত ও গীত হইত।

স্বদেশের কল্যাণের চেষ্টা করার জন্য রামমোহন রায়কে চতুর্দ্দিকে বিপদজাল বেষ্টন করিয়াছিল। তাঁহার হিতৈষী বন্ধুগণ তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিতেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বদা নির্ভীকচিত্ত।

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান বিভেতি কদাচন।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান বিভেতি কুতশ্চনঃ।

তিনি নিজেই সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন---

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়;
যাহারে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।

তিনি সাবধান হন নাই, এমন নয়। সে সকল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেন যে, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য অর্থব্যয় করিয়া রামমোহন রায় ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। দরিদ্রতার বিশেষ বিশেষ

কারণ কি ? স্বদেশের হিতের জন্য ধর্ম্মবিষয়ক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাশি রাশি পুস্তক ছাপাইয়া সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ। যে ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টিয়ান প্রচারক আড্যাম সাহেব তাঁহা দ্বারা ত্রিত্ববাদ হইতে একেশ্বরবাদে উপনীত হন, তিনি মতপরিবর্ত্তনের জন্য জীবিকাচ্যুত হইলে, রামমোহন রায় তাঁহাকে সপরিবারে প্রতিপালন করিতেন। কিছুকাল এইরূপ করিতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন দীন দরিদ্রদিগ:কে সাহায্যদান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেন যে, এই সকল কারণে রামমোহন রায়ের দৈনিক সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, কত ক্লেশ সহ্য করিলেন।

তাহার পর ইংলণ্ডগমন। সমস্ত দেশবাসী ও আত্মীয় স্বজনের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া জাহাজে উঠিলেন। সে সময়ে বিলাত যাওয়া কি সহজ কথা! তাঁহার অসাধারণ তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান সকল বাধা অতিক্রম করিল। তিনি রাজদেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পুত্র রমাপ্রসাদের বয়স তখন দশ বৎসর। "বাবা! কোথা যাও" বলিয়া রামপ্রসাদ কাঁদিতে লাগিলেন। তেজস্বী রামমোহন, "পুরুষবাচ্ছা। াঁদ কেন ?" বলিয়া তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন।

দেশের হিতের জন্য তাঁহাকে বিলাতে অতিশয় পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। পার্লেমেণ্ট হইতে নিযুক্ত কমিটিতে সাক্ষ্যদানের জন্য পরিশ্রম। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণের সময় ঐ কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য রামমোহন রায় ঐ কমিটীতে সাক্ষ্যদান করেন। যাহাতে এ দেশের মঙ্গল হয়, এমন সকল বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য বিলাতে বড় বড় লোকদিগের সহিত দেখা সাক্ষাত করেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের সহিত চিঠি পত্র লেখা চলিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে বিলাতে পুস্তক ছাপাইতে লাগিলেন।

এই সকল পরিশ্রমের মধ্যে ঘোর দরিদ্রতায় পড়িলেন। দিল্লীর বাদসা যে মাসহারা দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা পৌঁছিল না। তাঁহার বাটী হইতেও কোন অর্থ সাহায্য গেল না। সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপক উইলসন্ সাহেব বলেন যে, তিনি সে জন্য ঋণ করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে এমন হইল যে কি করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে আহার চলাও দুষ্কর হইল। আহারের জন্য পরের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার এমন দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল যে, পাছে ঋণের জন্য আদালতে গিয়া দাঁড়াইতে হয়। উইলসন সাহেবের মতে দেশের জন্য অতিশয় পরিশ্রম এবং ঋণের জন্য দুঃশ্চিন্তা তাঁহার রোগের কারণ।

বৃষ্টলে (Bristol) গিয়া কয়েক দিবস অবস্থিতির পর রোগগ্রস্থ হইলেন অনেক সেবা ও চিকিৎসায় জীবন রক্ষা হইল না। রোগশয্যায় বোধ হইত যে, অধিকাংশ সময় নীরব উপাসনায় যাপন করিতেন। মৃত্যুশয্যার শেষ বাক্য পবিত্র ওঁ। পবিত্র ওঁকার উচ্চারণ করিয়া তিনি নীরব হইয়া গেলেন; আর কোন বাক্য তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না। দেহত্যাগের পূর্ব্বে মহাপুরুষ, প্রাচীন মহর্ষিদিগের সাধনের ধন, নিজের চিরজীবনের অবলম্বিত পবিত্র ওঁকার উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, জীবনে বহুলোক সমাগমের মধ্যে, এবং মৃত্যুর নির্জ্জন দ্বারে সর্ব্বত্রই ভগবৎচিন্তাই তাঁহার আত্মার প্রধান কার্য্য ছিল। ধন্য মহাত্মন্! ধন্য তোমার জীবন! ধন্য মৃত্যু! হে স্বর্গগত ব্রাহ্মসমাজের আদি গুরু! ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার চরণে বার বার প্রণাম করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

হে রাজন্! তোমার উচ্চ স্বর্গলোক হইতে, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ

কর, যেন আমরা তোমার সুমহৎ দৃষ্টান্তানুসারে আমাদের জীবন নিয়মিত করিতে পারি।

হে পরমেশ্বর! হে পরমাত্মন্! হে ব্রাহ্মসমাজের দেবতা! তুমি যে আমাদের মঙ্গলের জন্য, এ দুর্ভাগ্য দেশের মঙ্গলের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য, এমন মহাপুরুষকে এদেশে প্রেরণ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার চরণে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে আমরা অক্ষম। হে প্রভো! হে পরম গুরু! তুমি তাঁহাদ্বারা যে ব্রাহ্মসমাজ এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, আমরা তাঁহার উন্নতির জন্য যেন প্রাণগত যত্নের ত্রুটি না করি। যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আপনার সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিলেন, জীবন সমর্পণ করিলেন, সেই সমাজের সেবার জন্য আমরা যেন প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া, সকল স্বার্থত্যাগ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি। ব্রাহ্মসমাজের সেবায় যদি জীবন অতিবাহিত করিয়া, অনন্ত জীবনে ঝম্পপ্রদান করিতে পারি, ইহজীবনে তোমার পবিত্র নাম ঘোষণা করিয়া তোমার অনন্ত ক্রোড়ে স্থান পাই, তবে, প্রভো! আমাদের পক্ষে এমন সৌভাগ্য আর কি আছে?

তোমার সাধু পুত্র তাঁহার জীবনে যে মহা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র যদি অনুকরণ করিতে পারি, তবে। জীবন ধন্য। যদি তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া নরনারী, ধনী দরিদ্র, সকলকে ভালবাসিতে, যথাসাধ্য সকলের সেবা করিতে পারি, তবে আমাদের পক্ষে তাঁহার সমাজে প্রবেশ করা সার্থক। হে প্রভো! আমরা যেন, তোমার সেই সাধু পুত্রের ন্যায় দেশের কল্যাণের জন্য, সর্ব্বপ্রকার কষ্ট বহন করিতে পারি। ব্রাহ্ম-সমাজের মঙ্গলের জন্য অসঙ্কোচে আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে পারি। তিনি যেমন চিরজীবন, ষোড়শ হইতে দ্বিষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, সর্ব্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া, সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়া, পরিবারবর্গ, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবাসী, গ্রামবাসী, স্বদেশবাসী, সকলের মতামত, বিরাগ, ঘৃণা, সত্যের

খাতিরে, ধর্ম্মের খাতরে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, নির্ভয়ে, সত্যের জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছিলেন, আমরাও যেন সেইরূপ তাঁহার দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া, ধর্ম্মের অনুগত হইয়া, দেশের সেবা করিয়া এ জীবন সফল করিতে পারি। আর যে কয় দিন বাঁচিয়া থাকি, তোমার সেই সাধু পুত্রের ন্যায় জীবনের কর্ত্তব্য সকল পালন করিয়া, হাসিতে হাসিতে মৃত্যু নদীর পরপারে সেই অমরলোকে গমন করিয়া কৃতার্থ হই।

ওঁ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।